ব্যালেরিনা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যাঁর রচনায় একদিন

সমগ্র ইউরোপের

হৃৎস্পন্দন

শুনেছিলাম

১৩৬১ সালের পূজা সংখ্যা 'জনসেবকে' ব্যালেরিনা প্রকাশিত হয়। বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধনের পর শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ : ১৩৬৩
কলিকাতা

রচনাকাল

অক্টোবার ১৯৫০ থেকে জুলাই ১৯৫৬

লণ্ডন ও কলিকাতা

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর (৩য় সংস্করণ)
এই মর্ত্তভূমি (২য় „)
সুরের মিছিল (৩য় „)
মনে মনে (২য় „)
মুখর লণ্ডন (২য় „)
ছায়া মারীচ (২য় „)
নতুন বাসর
ইভনিং ইন প্যারিস (২য় সংস্করণ)
জনসম্রাট
বিপাশা (যন্ত্রস্থ)
দুর্গতোরণ („)

এমনি করে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সুশোভন যে এতোখানি নিচে নেমে যাবে সেকথা আমি কোনোদিনও ভাবতে পারিনি।

লণ্ডন শহরে মেয়ে বন্ধু পাওয়া বিশেষ কঠিন নয়। অনেকের চার পাঁচটা করেও বন্ধু থাকে। কেউ খেলা করে, কেউ প্রেমে প'ড়ে হা হুতাশ করে, আবার কেউ কেউ বিয়ে করে দেশেও নিয়ে যায়।

সুশোভন ছিলো লণ্ডন ইস্কুল অব ইকনমিক্সের নাম করা ছাত্র। প্রফেসার হ্যারল্ড লাস্‌কি একবার তার এক রচনা প'ড়ে আমাদের সামনে উক্তি করেছিলেন, জীবনে আমি অনেক ছাত্র দেখেছি সুশোভন, কিন্তু তোমার মতো ছাত্র পেয়ে আমি গর্ব বোধ করছি।

তাই মেয়েদের নিয়ে খেলা করবার ছেলে সুশোভন নয়। আর আমার ধারণা ছিলো প্রেম করবারও তার সময় নেই। সেই সুশোভন হঠাৎ জার্মানীর এক মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠলো। ঘন ঘন ক্লাশ কামাই করতে লাগলো। বন্ধু সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এমন কি, তার অন্তরংগ বন্ধু হয়ে আমিও জানতাম না সে কখন কোথায় থাকে আর কী করে সময় কাটায়।

অবশ্য গিজলার সংগে সুশোভনের আলাপ হয় আমারই যোগাযোগে। আমার বন্ধুর নাম এলফ্রিডা। তারও বাড়ি জার্মানী—ব অনে।

লণ্ডনে ইংরেজী শিখতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে মেয়েরা আসে। কিন্তু সরকারী কড়া নিয়ম কানুনের জন্যে দেশ থেকে খরচ আনাবার উপায় থাকে না তাদের। তাই সাধারণত ইংরেজ

পরিবারে ঘরের কাজ করে তারা ইংরেজী শেখে। সামান্য মাইনেও পায়। অনেক বড়ো ঘরের মেয়েও এমনি ক'রে বেশ কিছুদিন লণ্ডনে কাটিয়ে যায়।

এলফ্রিডা থাকতো লণ্ডন থেকে কিছু দূরে জেরাডস্‌ক্রশে। সেই একই বাড়িতে কাজ করতো গিজলা। সে লণ্ডনে এসেছে খুব সম্প্রতি।

এক রবিবার দুপুরে এলফ্রিডা আমাকে আর সুশোভনকে নেমন্তন্ন করলো। গিজলা ছাড়া আর কেউ থাকবেনা। বাড়ির কর্তা গিন্নি বেরিয়ে যাবে বলেই এ সুযোগ পাওয়া গেছে।

ঠিক হ'লো আমরা মেরিলিবোন স্টেশন থেকে সকাল দশটার ট্রেন ধ'রে প্রায় এগারোটার সময় জেরাডস্‌ক্রশে পৌঁছবো। সুশোভন আমার সংগে স্টেশনে ঠিক সময় দেখা করবে। কিন্তু শেষ অবধি সে এসে পৌঁছলো না। তাই আমি একাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এই প্রথমবার আমি জেরাডস্‌ক্রশে এলাম। এলফ্রিডা আমাকে খুব ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলো তাদের বাড়ি কোথায়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি তার নির্দেশ মতো পথ চলতে লাগলাম।

লণ্ডন থেকে হঠাৎ জেরাডস্‌ক্রশে এসে অবাক হতে হয়। ঠিক যেন একটি ছোটো গ্রাম। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। গ্রীষ্মের অনেক গন্ধহীন' রঙ বেরঙের ফুল ফুটে উঠেছে। এপাশে ওপাশে দেখা যায় রবিন পাখি। দূরে গরু চরছে। হঠাৎ মোটরের হর্ণ চমক ভাঙায়।

অনেক বড়ো লোক এখানে বাড়ি করেছে। তাই মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে সুন্দর বাড়ি চোখে পড়ে। এরা এখান থেকে রোজ মোটরে লণ্ডনে যায়।

গেটের সামনে এলফ্রিডা আর গিজলা আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো। দূর থেকে গিজলাকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। অমন রূপ লণ্ডনে আর কখনও আমার চোখে পড়েনি।

আমাকে দেখতে পেয়ে এলফ্রিডা গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, সুশোভন কোথায়?

সে ঠিক সময় স্টেশনে আসতে পারেনি, আমি বললাম, কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না—

এলফ্রিডা আমার সংগে গিজলার আলাপ করিয়ে দিলো। অনেক কষ্টে ভুল ইংরেজীতে কথা বলে গিজলা। প্রথম প্রথম বাইরের মেয়েরা লণ্ডনে এমনি থাকে। কয়েক মাসের মধ্যে ইংরেজী রপ্ত করে নেয়। তবু মনের ভাব বুঝতে কিংবা বোঝাতে কারোর কোনো অসুবিধা হয় না।

এ বাড়ির মালিকের নাম কোহেন। জাতে ইহুদী। স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা—এই নিয়েই সংসার। বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে এখন। মৃদু বাতাসে দুলে ওঠে। হাল্কা রোদ্দুরে ঝলমল করে।

বাড়ির পেছনেও বাগান করা হয়েছে। সেখানে বেতের চেয়ারে ব'সে আমরা গল্প করতে লাগলাম। আজকের দিন বড়ো বেশি সুন্দর সেকথা ওরা বার বার আমাকে জানিয়ে দিলো।

যতোই ঘনিষ্ঠতা করিনা কেন, এমন মেয়েদের সম্পর্কে আমার মনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিলো। কখনো ভুলতে পারতাম না এরা ঝিয়ের কাজ করে। তবু এদের সংগে মিশতে দ্বিধা করতাম না কারণ এতো সহজে ইংরেজ মেয়েদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করা যায় না।

যা' হোক প্রায় দু'টোর সময় সুশোভন এলফ্রিডাকে টেলিফোন করলো। ভয়ানক দুঃখিত হ'য়ে সে এলফ্রিডার কাছে ক্ষমা চেয়ে জানালো যে কাল সারা রাত পড়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার।

এলফ্রিডা বললো, তাতে কী হয়েছে। আর একদিন সুযোগ পাওয়া গেলেই তোমাকে বলবো।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, বিকেলে কী করবে তোমরা?

লণ্ডনে গিয়ে একটু বেড়াবার ইচ্ছে আছে।

এক কাজ করো, সোজা আমার বাড়ি চ'লে এসো। তারপর আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো। আমি নেমন্তন্ন করছি আজ তোমাদের।

অনেক ধন্যবাদ সুশোভন। কিন্তু মিসেস কোহেনরা ফিরে না এলে আমি তো যেতে পারবো না। গিজলা আর তোমার বন্ধু পাঁচটার সময় তোমার ওখানে পৌঁছোবে। তোমরা সবাই সাড়ে সাতটায় আমাকে নিতে মেরিলিবোনে এসো।

বেশ তাহ'লে এই ঠিক রইলো।

ওদিকে ওরা দুজন আমাকে সংগে নিয়ে সমস্ত বাড়িটা ভালো করে দেখালো। এদের দু'জনের থাকবার জন্যে দুটো আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। সুন্দর ক'রে সাজানো সে-ঘর দু'টি। দেখলে কে বলবে এরা ঝিয়ের কাজ করে।

মিসেস কোহেনের একমাত্র বাচ্চাকে দেখবার জন্যে গিজলাকে রাখা হয়েছে। আর এলফ্রিডার ওপর দেয়া হয়েছে সংসার দেখবার ভার। অর্থাৎ তাকে সংসারের সব কাজই করতে হয়। রান্না করা থেকে ঘর পরিষ্কার করা অবধি। সপ্তাহে এদের দেড় দিন ছুটি। তখন এরা ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ায়।

এলফ্রিডার এমনি এক ছুটির দিনে তার সংগে আমার আলাপ হয়। অবশ্য এমন আলাপের বেশি মূল্য আমি কখনও দিইনা। জানি ছুদিন পর এদের সংগে আর সম্পর্ক থাকে না। যে যতো বেশি খরচ করতে পারে এমন মেয়েরা তার সংগে ততো বেশি ঘনিষ্ঠতা করে।

লণ্ডনে বেশিদিন বাস করে এমন স্বার্থপরের মতো মতামত আমার অজ্ঞাতেই গড়ে উঠেছে। এদেশের মেয়েদের আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলে আমার কথা একটুও না ভেবে এরা সংগে সংগে ছেড়ে যাবে। ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে হয়তো কন্টিনেণ্টের মেয়েরা একটু কম স্বার্থপর। কিন্তু বেশি দিন লণ্ডনে বাস করলে সকলেই এক রকম হয়ে যায়। আর ওদের সংগে তাল রাখতে হলে আমিই বা ওদের মতো হবো না কেন। ছুদিনের জন্যে এখানে এসেছি। গভীর সমবেদনায় জীবনের বিশেষ অধ্যায় বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছে বা অবসর কোনোটাই আমার নেই।

এই কারণে সুশোভন প্রায়ই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতো। অনেক বার অনেক উপদেশ দিয়ে সে আমাকে বুঝিয়েছে যে এমন করে অন্যকে বিচার করলে পরবর্তী জীবনে ঠকতে হয়। নিজের কাছে নিজেকে ছোটো করার চেয়ে বড়ো অন্যায় বোধহয় আর কিছু নেই।

কিন্তু সুশোভনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো আমি প্রয়োজন মনে করি না। এসব ব্যাপারে তার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। পরে আমার কী মনে হবে সেকথা ভেবে এখন এখানকার অতি সাধারণ মেয়েদের কাছে ইচ্ছে করে ঠকতে আমি রাজি নই।

বিদেশের যেসব মেয়েরা লণ্ডনে ইংরেজ পরিবারে ঘরের কাজ

করে, ছুটি পেলে তারা ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়। এদেশে নানা রকম ক্লাবের অভাব নেই। এসব ক্লাবে সাধারণত অন্য দেশের ছেলেমেয়েদের ভিড় বেশি। ব্যস্ত ইংরেজের কোনোদিকে তাকাবার সময় নেই। তাই অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা এমনি ক্লাবে এসে নিঃসঙ্গতার অভাব দূর করে।

আমার সংগে এলফ্রিডার এক ক্লাবে আলাপ হয়েছিলো।

এই সব ক্লাবে ইংরেজ বড়ো একটা আসে না। ফ্রান্স, ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানী আর বাইরের অনেক মেয়ে যারা ইংল্যাণ্ডে চাকরি করতে আসে আর আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, সিলোন থেকে যেসব ছাত্ররা পড়াশুনো করতে আসে—তারা প্রত্যহ ভরে তোলে এমনি ক্লাবের সন্ধ্যা।

আমি যেদিন এলফ্রিডাকে ক্লাবে দেখলাম সেদিন সেখানে কী একটা বিশেষ আয়োজন ছিলো। একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক বিশ্বমৈত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই ভদ্রলোকের একটি কথাও আমার কানে যাচ্ছিলো না, আমি চারপাশে অনেক অচেনা মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসেছিলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম এলফ্রিডা আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও সেখানে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিলো না। একটা ছুতো খুঁজছিলাম কেমন করে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এলফ্রিডাকে বেরোতে দেখে আমিও প্রায় তার পেছন মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

নিচে লাউঞ্জ। এখানে ওখানে অনেক বই ছড়ানো রয়েছে। তখন শীতকাল। ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছে। এলফ্রিডার পাশে একটি চেয়ারে বসে পড়ে আমি সামনের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা তুলে নিলাম।

সুযোগ পেয়ে এক সময় এলফ্রিডাকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ ওভাবে উঠে এলে যে? বক্তৃতা শুনতে তোমার ভালো লাগলো না বুঝি?

না, অর্ধেক কথা বুঝতেই পারি না, হেসে এলফ্রিডা বললো, আর সারাদিন বাড়িতে মুখ বুজে কাজ করতে করতে ক্লান্তি এসে যায়। তাই এখানে আসি কথা বলতে—কথা শুনতে ইচ্ছে করে না।

আমারও ঠিক তাই, আমিও হাসলাম, তাই তো তোমার পেছন পেছন উঠে এলাম—

এলফ্রিডা বললো, যাক একজন গল্প করবার লোক পেয়ে বাঁচা গেল। তুমি ছাত্র বুঝি?

হ্যাঁ। আর তুমি?

ইহুদী পরিবারে বাড়ির কাজ করি। আমার বাবা ডাক্তার। যুদ্ধের পর দেশে কোথাও কাজ জুটলো না তাই এখানে চাকরির জন্যে আসতে হয়েছে।

বেশ সুখে আছো তো এদেশে?

আমার কথা শুনে এলফ্রিডা ম্লান হাসলো, সুখে থাকবো বলে এসেছিলাম কিন্তু এসে দেখছি দেশের কথা মনে পড়ে বড়ো মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম, খুব স্বাভাবিক। তা ছাড়া এখানে তোমার বোধহয় খুব একা একা লাগে? ইংরেজরা তো কথাবার্তা বলতে জানে না—কী বল?

ঠিক বলেছো, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এলফ্রিডা বললো, এরা এখানে এমন যন্ত্রের মতো চলে যে মাঝে মাঝে আমার ক্লান্তি এসে যায়।

সুযোগ বুঝে আমি বললাম, এখানে বসে থাকতে আর ভালো

লাগছে না। চল কাছাকাছি কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাক?

খুশি হয়ে এলফ্রিডা বললো, চল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ওভারকোট পরতে সাহায্য করতে করতে ভাবতে লাগলাম এই কারণেই কন্টিনেন্টের মেয়েদের সংগে মিশতে আমি ভালোবাসি। এতো সহজে ইংরেজ মেয়ের সংগে ঘনিষ্ঠতা করা যায় না। এলফ্রিডা যদি ইংরেজ হতো তা হলে এক ঘরে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকলেও তার সংগে অন্য কেউ আলাপ না করিয়ে দিলে আমি একটি কথাও বলতে পারতাম না। আর বললেও সে খুব বেশি অবাক হতো। এবং একদিনের আলাপে আমার সংগে কিছুতেই এলফ্রিডার মতো বাইরে বেরোতে রাজি হতো না।

কন্টিনেন্টের মেয়েরা যুদ্ধের পর দেশে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। অর্থাভাবের জন্যে তাদের দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জোটেনি। জীবনকে তারা কোনোমতেই উপভোগ করতে পারেনি। লণ্ডনে আসবার পরও ইংরেজের কাছ থেকে খুব ভালো ব্যবহার তারা পায়নি। এরা ওদের কৃপা করেছে—ঘৃণা করেছে। ইংরেজ স্বভাবতই গম্ভীর, এদের সংগে ইচ্ছে করে আরও গম্ভীর ব্যবহার করেছে। তাই অন্যান্য দেশের মেয়েরা লণ্ডনে এসে প্রথমে খুব নিরাশ হয়েছে। আর যে তাদের সংগে ভালো ব্যবহার করে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। কিছুদিন পর যখন উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে তখন আবার অন্য বন্ধুর আহ্বানের প্রতীক্ষা করেছে। দেশে ঘা খেয়ে আর বিদেশে আঘাত পেয়ে কন্টিনেন্টের মেয়েরা ঘর বাঁধবার স্বপ্ন আর সহসা দেখতে পারে না। হাল্কা হাওয়ায় প্রজাপতির মতো তারা উড়ে বেড়ায়। যে তাদের জন্যে যতো বেশি খরচ করে তারাও তাদের সংগে ততো বেশি ঘনিষ্ঠতা করে।

যখন খরচের মাত্রা কমে যায় তখন তারা বিনা দ্বিধায় তাকে ছেড়ে যায়।

এসব কথা আমি খুব ভালো করেই জানতাম। তাই তাদের নিয়ে মাতামাতি করলেও সব সময় এই মনে করে সতর্ক থাকতাম যে কোনো মুহূর্তে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

তোমার সংগে আবার কবে দেখা হবে এলফ্রিডা ?

সপ্তাহে দুদিন আমি লণ্ডনে আসি—

লণ্ডনে এলেই আমার সংগে দেখা করবে। তোমার সংগে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে।

এলফ্রিডা হেসে বললো, ধন্যবাদ।

তারপর তার সংগে প্রায়ই আমার দেখা হতে লাগলো। এবং একদিন সুশোভনের সংগে আমি এলফ্রিডার আলাপ করিয়ে দিলাম।

আগেই বলেছি সুশোভন একটু অন্য প্রকৃতির মানুষ। আমার সংগে এলফ্রিডাকে এখানে ওখানে ঘুরতে দেখে সে ধরে নিলো আমি বোধহয় তাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। তাই একদিন অকারণে আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলো, তুমি এলফ্রিডাকে ভালোবাসো ?

আমি জোরে হেসে বললাম, দূর! তুমি কি পাগল হলে সুশোভন ?

আমার কথা শুনে সুশোভন একটু অবাক হ'য়ে বললো, তাহলে তুমি ওর সংগে অমন ব্যবহার কর কেন ? ও নিশ্চয়ই ভাবে যে তুমি ওকে ভালোবাসো ?

ওরা তেমন মেয়ে নয়। ওসব আজে বাজে কথা ভেবে ওরা সময় নষ্ট করে না। যে মুহূর্তে ওদের জন্যে আমি পয়সা খরচ

করতে পারবে না সেই মুহূর্তে ওরা আমার কথা না ভেবে অন্য কারোর কথা ভাবতে শুরু করবে।

সুশোভন গম্ভীর স্বরে আমাকে শুধু বললো, মানুষের ওপর এমন অবিচার তুমি কেমন করে কর আমি বুঝতে পারি না।

আমি হেসে বললাম, যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন তুমি এই সব মেয়েদের সংগে আমার মতো ঘনিষ্ঠতা করবে।

আমি যথাসময় গিজলাকে নিয়ে সুশোভনের বাড়ি কেনসিংটনে পৌঁছোলাম। আমাদের বসতে বলে সুশোভন বিস্মিত দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ গিজলার দিকে তাকিয়ে রইলো।

গিজলা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী দেখছো ?

তোমার চোখ দুটো একেবারে নীল।

আমি যাদু জানি, গিজলা হেসে বললো, একবার আমার চোখের দিকে তাকালে কেউ আর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না।

হয়তো তাই, সুশোভন বললো, গিজলা তুমি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলে ?

জীবনে নয়।

দেশে কী করতে তুমি ?

নাচ—ব্যালে। আমি থিয়েটারে ছিলাম, গর্বের হাসি হেসে গিজলা বললো, আমি সব চেয়ে ভালো নাচতে পারতাম আর অন্য সকলের চেয়ে রূপসী ছিলাম—ওরা আমাকে বলতো ব্যালেরিণা।

তুমি কি এখানে নাচের ব্যাপারে এসেছো ?

গিজলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, না। শেষের দিকে আমি ব্যালে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

চোখে কৌতূহল নিয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, কেন ?

গিজলা প্রশ্ন শুনে দু এক মিনিট চুপ করে থেকে ম্লান স্বরে বললো, শেষের দিকে দল ভেঙে যায়। লোকের খাবার পয়সা নেই ব্যালে দেখবে কে! আমারও মাইনে আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। শেষে এতো কম পেতে লাগলাম যে চাকরি করে আমার কোনো লাভ হতো না। যখন ভাবছি অন্য কী করবো তখন একদিন আমাদের থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। দেশে অন্য কোনো কাজ না পেয়ে আমি এখানে চলে এলাম।

দেশে তোমার কে আছে গিজলা ?

মা বাবা, একটু থেমে গিজলা বললো, আর যারা ছিলো তারা যুদ্ধে মরে গেছে।

একদিকে চুপ করে বসে সুশোভনের কথা বার্তা শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এমন কৌতূহল নিয়ে সে এখানে আর কারোর সংগে কথা বলেছে বলে আমার জানা নেই। যাক আমি মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলাম গিজলার সংগে বেশি মিশলে সুশোভন বুঝতে পারবে এদের স্বভাব কেমন আর ওর ধারণাও খুব শিগগির বদলে যাবে।

ছলোছলো চোখে হঠাৎ গিজলা সুশোভনের একটা হাত ধরে বললো এতো কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেন ? এমন করে অনেক দিন কেউ আমার সংগে কথা বলেনি। সব কথা মনে করে আমার কান্না পাচ্ছে যে—

দুঃখ করোনা গিজলা, খুব আস্তে আস্তে সুশোভন বললো, সব কিছুকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে হয়। কেমন করে শোকে দুঃখে স্থির থাকতে হয় আমি তোমাকে সে মন্ত্র শিখিয়ে দেবো।

অবাক হয়ে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, কেমন করে ?

যেন তার প্রশ্ন শুনতে পায়নি এমন স্বরে সুশোভন বললো, গিজলা তুমি লেখাপড়া শিখতে চাও? ইংল্যাণ্ডের নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়াতে চাও?

তাইতো এখানে এসেছি।

আমি তোমাকে সব শেখাবো, সুশোভন হাসলো, জানো আমি খুব ভালো ছাত্র, ফিরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা অধ্যাপক হবো—

বাধা দিয়ে গিজলা বললো, জানি। আমার বন্ধু এলফ্রিডা তোমার নাম দিয়েছে, স্নব্।

তাই নাকি? হা হা ক'রে হেসে সুশোভন বললো, দাঁড়াও ওর সংগে দেখা হোক একবার।

যথাসময় আমরা তিনজন মেরিলিবোন স্টেশনে এলফ্রিডাকে আনতে গেলাম।

ব্যস্ তারপর বলতে গেলে সুশোভন একেবারে নিখোঁজ হ'লো। এলফ্রিডার কাছে খবর পেতাম সে ঘন ঘন ফোন করে গিজলার খবর নেয়। গিজলাও তার সংগে নাকি অনেকক্ষণ কাটায়। আর কেউ আজকাল সুশোভনের দেখা পায় না। ফোন করে দেখা পেতে চাইলে বলে, এখুনি বেরিয়ে যাবো। কোনো না কোনো অজুহাতে সে সব সময় প্রত্যেককে এড়িয়ে চলে।

ব্যাপারটায় আমি মনে মনে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলাম। এ কী কাণ্ড আরম্ভ করলো সুশোভন! খেলা করবার ছেলে সে নয়। আর যদি অবশেষে মেতে উঠলো তাহলে এমন মেয়েকে নিয়ে কেন? সুশোভনের মূল্য গিজলার মতো মেয়ে কী বুঝবে? অমন রূপ তো কতো মেয়ের থাকে। কিন্তু শুধু রূপ নিয়ে তো সুশোভনের চলবে না। গিজলাও তাকে খুব বেশিদিন সহ্য করতে

পারবে না। একুটা সংঘাতিক উপসংহারের কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে সুশোভন কতো ভালো বন্ধু পেতে পারতো। গিজলার চোখে মুখে আমি একটা সুলভ ভাব দেখেছিলাম। ও হচ্ছে অতি সাধারণ মেয়ে। সত্যিকার প্রেমের মানেও বুঝবে না, মর্যাদাও দেবে না। অবশ্য এসব বোঝবার মতো সাংসারিক বুদ্ধি সুশোভনের একেবারেই নেই।

কিন্তু সে আমাকে এড়িয়ে চললেও তার সমস্ত খবর যথাসময়ে আমার কানে আসতো। আগেই বলেছি গিজলা আর এলফ্রিডা কাজ করতো একই বাড়িতে।

গিজলা বাড়ি ফিরে সুশোভনের সমস্ত গল্প বেশ রসিয়ে বলতো এলফ্রিডাকে আর সেইসব শুনে সে আমার ওপর রাগে জ্বলে উঠতো। কারণ সুশোভন গিজলাকে নিয়ে যে পরিমাণ মাথা ঘামায় আমি এলফ্রিডাকে নিয়ে তার সিকি ভাগও ঘামাই না।

একদিন এলফ্রিডা আমাকে বললো, আমি তোমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছি—

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

চমকে উঠলাম কারণ এখন এলফ্রিডা যদি অন্য কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে যায় তাহলে আমার খুব অসুবিধা হবে। সামনে একটা পরীক্ষা আছে। আবার ঘুরে ঘুরে ওর মতো বন্ধু খোঁজবার সময় হবে না।

এলফ্রিডা বললো, তুমি আমার জন্যে তো কিছুই কর না। ওদিকে সুশোভন গিজলার জন্যে কিনা করে!

কী করে বল তো ?

কতো গল্প বলে ওকে। কতো বই পড়ায়। লণ্ডন স্টেজের সব ভালো ভালো নাটক ও এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে। আর পড়েওছে

অনেক। সুশোভন ওকে প্রত্যেকটা বই কিনে দিয়েছে—

তবে তো ভালোই হলো, সিগ্রেট ধরিয়ে আমি বললাম, ইচ্ছে থাকলে গিজলার কাছ থেকে বইগুলো নিয়ে তুমি তো অনায়াসে পড়ে নিতে পারো।

মুখ ভংগী করে এলফ্রিডা বললো, থাক আর উপদেশ দিতে হবে না তোমায়। কিন্তু থিয়েটার দেখার কী হবে? তাও কি ওদের সংগে গিয়ে দেখবো? তাহলে তোমার সংগে বন্ধুত্ব করে আমার লাভ?

ওহো, হেসে আমি বললাম, এই কথা, বেশ তো থিয়েটার তোমায় দেখাবো একদিন।

আর দেখিয়েছো। তোমার দৌড় আমার জানা আছে। শেষ অবধি সেই এক শিলিংএর নিউজ সিনেমায় নিয়ে হাজির কর—

কিন্তু তুমি তো নিউজ সিনেমা দেখতে ভালোবাসো এলফ্রিডা?

ছাই বাসি। তোমার সংগে মিশে লণ্ডনের কিছুই আমার এখনও দেখা হলো না।

পরীক্ষা হয়ে গেলে তোমাকে আমি সব কিছু দেখাবো।

যেন আপন মনে এলফ্রিডা বললো, গিজলাকে আমার হিংসে হয়! কী সৌভাগ্য ওর! কতো জেনেছে এর মধ্যে—কতো পড়েছে! যতোক্ষণ বাড়িতে থাকে ও শুধু পড়ে। জানো তো গিজলা ইংরেজী ভালো জানে না, তাই আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করে, ট্র্যাজিক এলিমেণ্ট কী, এপিক কী, ক্রিস্টফার ফ্রাইএর সংগে এলিয়টের তফাৎ কোথায়। আরে ছাই আমি কি জানি ওসব? তুমি তো খুব শিখিয়েছো আমায়—

আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এলফ্রিডাকে খুশি করবার জন্যে বললাম, সব শেখাবো। তোমার খুব বুদ্ধি কিনা ওসব তুমি সাত

দিনে শিখে নিতে পারবে।

আমার কথা শুনে এলফ্রিডা একটু খুশি হয়ে বললো, দেখা যাক তুমি কী কর আমার জন্যে!

তাহলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে সুশোভন। এতো বুদ্ধিমান হয়ে অবশেষে ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। ওসব কথা কী বুঝবে ব্যালের এক অতি সাধারণ মেয়ে! এখন সুশোভনকে নিয়ে মেতেছে কারণ ভেবেছে ওর অনেক পয়সা। তারপর আর একজন বড়োলোকের দেখা পেলেই সুশোভনকে এড়িয়ে যাবে। ওরা লণ্ডনে আসে জ্ঞান চর্চা করতে নয়, ফূর্তি করতে।

কিন্তু আমার এই সর্বনাশ করবার কী দরকার ছিলো সুশোভনের? এখন দেখা হলেই এলফ্রিডা বলবে, সুশোভন গিজলার জন্যে এ করে ও করে তা করে আর তুমি আমার জন্যে কিছুই করো না—

আমি সুশোভনের মতো এতো বোকা নই যে ওই সব মেয়েকে নিয়ে সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকবো কিংবা প্রচুর অর্থব্যয় করে জ্ঞান বিতরণ করবো। এখানে এসেছি শিখতে—শেখাতে নয়।

ভাবলাম বুদ্ধিমান ছেলের মতো এবার আর এক বন্ধুর খোঁজ করা দরকার। কেননা বুঝেছিলাম যে কোনো মুহূর্তে এলফ্রিডা আমাকে ত্যাগ করতে পারে। কাজেই ও আমাকে ছাড়বার আগে আমারই ওকে ছাড়া দরকার। শেষে কি ওই রকম মেয়ের কাছে অপমানিত হবো।

আমি নতুন বন্ধু পাবার আশায় যথারীতি আবার সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে যেতে লাগলাম।

একদিন এক নতুন বন্ধু পেয়ে গেলাম। সেও জার্মান। তার নাম হানা। তবে হানা এলফ্রিডার চেয়ে অনেক ভালো দেখতে।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম আর একবার কোনো বিষয়ে অনুযোগ করলে আমি তার সংগে সব সম্পর্কের ছেদ টেনে দেবো।

আর ঠিক তাই করলাম।

কয়েকদিন পর বেশ কঠিন স্বরে এলফ্রিডা আমাকে বললো, তোমার রুচি বলে কিছু নেই।

তার কথা শেষ হবার সংগে সংগে আমি বললাম, তা থাকলে আর তোমাকে বন্ধু করবো কেন ?

অমন করে কথা বলোনা আমার সংগে।

আমি তো কথা বলছিনা। শুধু তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।

তোমার ওপর একেবারে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছি আমি।

আমিও তোমার ওপর খুব প্রসন্ন হয়ে নেই।

আচ্ছা তুমি কেমন লোক বলতে পারো ? জানো যেদিন দেখা হয় না সেদিন দুতিনবার ফোন করে সুশোভন গিজলার খবর নেয় ?

আমি সুশোভন নই। আর ও আজকাল প্রায়ই ক্লাশ করতে যায় না কিন্তু আমি নিয়মিত যাই—

তবু মাঝে মাঝে আমার সংগে ফোনে কথা বলতে তো পারো ? বোঝো না কেন গিজলার কাছে আমাকে লজ্জায় পড়তে হয়—

আমার অতো সময় নেই—

আমারও তাহলে আর সময় নেই তোমার সংগে দেখা করবার

আমি এলফ্রিডার মুখের ওপর বললাম, করো না।

বেশ—

আমাকে একা রাস্তায় ফেলে এলফ্রিডা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাস ধরলো। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগ্রেট ধরালাম। এতো সহজে এলফ্রিডার বন্ধন কাটাতে পারবো ভাবিনি। যাক এবার

হানার সংগে অসঙ্কোচে মিশতে পারবো। দোটানায় পড়ে কিছুদিন বেশ অসুবিধার মধ্যে ছিলাম। আমি জানতাম এলফ্রিডার ওপর আমার আর কোনো দায় থাকবে না। ও আর কোনোদিনও আমার সংগ কামনা করবে না। একবার বন্ধন ছিন্ন হলে এদেশের মেয়ে পিছনে তাকিয়ে সাধারণত দীর্ঘশ্বাস ফেলে না।

সাতদিনও বিরহে কাল কাটালো না এলফ্রিডা। আমি খবর পেলাম আমার আর এক বন্ধু রথীন সেনের সংগে তার নাকি বেশ অন্তরংগতার সৃষ্টি হয়েছে।

হয় হোক। আমার কী এলো গেল তাতে! আমার নতুন বন্ধু হানা এলফ্রিডার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। শেষ অবধি আমারই তো জয় হলো।

তবে ক্ষতি আমার একটু হলো বৈকি। কেননা এলফ্রিডার সংগে বিচ্ছেদ হবার পর সুশোভনের আর কোনো খবর আমি পেতাম না। তাই এলফ্রিডার কথা মনে হলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেতো। আর গিজলাকে ফোন করে সুশোভনের খবর নেয়া ভালো দেখায় না। এলফ্রিডা হয়তো আমার খুব নিন্দে করেছে তার কাছে। কে জানে ওরা দুজনে আমাকে অপমান করবার সুযোগ খুঁজছে কিনা। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নীরব থাকতে হলো। মনে মনে শুধু বললাম, চুলোয় যাক সব কটা এক সংগে!

এতোদিন সুশোভনের পৃথিবী যেন বইএর দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিলো। পড়াশুনোর বাইরে যে আর কিছু থাকতে পারে সেকথা ভেবে দেখবার অবসর তার হয়নি। বিলেতে এসেও কোনো পরিবর্তন তার হলো না। বাইরের রূপ রস আর গন্ধের

চেয়ে দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি তার কাছে বড়ো হয়ে উঠলো। তাই এখানে ওখানে ঘুরে না বেড়িয়ে সে বইএর মধ্যে আরও বেশি করে ডুবে গেল। বলতে গেলে আজও লণ্ডনের কিছুই সে ভালো করে চেনেনা। কিন্তু নানা বইএর মধ্যে দিয়ে এদেশের ইতিহাস সে অনেক জেনেছে। আরও জানবার ব্যাকুলতায় সে উন্মুখ।

এমনি ব্যস্ততার মাঝে সুশোভনের সংগে হঠাৎ একদিন গিজলার আলাপ হলো। কলেজে পড়াশুনোর ফাঁকে অন্য নানা আলোচনার সূত্র ধরে তার সংগে এর আগে আরও অনেকের আলাপ হয়েছে। কিন্তু এমন করে সুশোভনের সমস্ত দেহ মন প্রাণ মেতে ওঠেনি। গিজলার নীল চোখে সে যেন তার নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছে। আর কী যে হয়েছে তাকে দেখবার পর থেকে, সুশোভনের কেবলই তার সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করে। তার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে। থেকে থেকে সুশোভনের মনে হয়, একে যেন সে অনেক দিন থেকে চেনে।

কিন্তু শুধু ওইটুকুই। তার এই আকস্মিক নিবিড় উপলব্ধির কথা হয়তো আর কেউ জানতে পারবে না। সে আর কাউকে বোঝাবার চেষ্টাও করবেনা কোনোদিন। জীবনের কোনো অবস্থাতেই যেন ব্যক্তিগত স্বার্থ তার কাছে বড়ো না হয়ে ওঠে। তার মনের কোনায় যদি ফুল ফুটে ওঠে, তা'হলে তার সৌরভ সে একাই গ্রহণ করবে। কারোর কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারবে না সে। সুশোভনের সব সময় ভয় পাছে তার দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। গিজলা যদি কখনও তার মনের দুর্বলতা জেনে তাকে কৃপা করে কিংবা স্বার্থপর ভেবে দূরে সরে যায় তা হলে তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু থাকবেনা সুশোভনের। তাই সে

ঠিক করলো কখনও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেনা গিজলার কাছে। সে সত্যি এক নতুন পরীক্ষা করবে। গিজলাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে নতুন মানুষ তৈরী করে তুলবে। তা যদি করতে পারে তা হলে সার্থক হবে সুশোভনের পরিশ্রম। ছেলেমানুষের মতো সে এক নতুন নেশায় মেতে উঠলো।

আলাপ হবার পরদিন অকারণে গিজলাকে টেলিফোন করলো সুশোভন। এলফ্রিডা ফোন ধরলো। সুশোভনের মতো লোক যে এতো কম আলাপে গিজলার মতো মেয়েকে ফোন করবে এলফ্রিডা প্রথমে সেকথা কল্পনা করতে পারেনি।

এলফ্রিডা হেসে বললো, সুশোভন শুনলাম তুমি নাকি গিজলাকে লেখাপড়া শেখাবে—সত্যি?

সুশোভনও হাসলো, লেখাপড়া কেউ কাউকে শেখাতে পারে না এলফ্রিডা, ও যদি পড়াশুনো করতে চায় তাহলে আমি ওকে সাহায্য করবো শুধু।

এলফ্রিডা বললো, তোমার কথা শুনে ও একেবারে মেতে উঠেছে। বলেছে, আমার সংগে কেউ কখনও এমন করে কথা বলেনি। যদি বলতো তাহলে আমি আরও আগে হয়তো লেখাপড়া আরম্ভ করতে পারতাম।

সুশোভন বললো, আমি তো এমন কিছুই বলিনি গিজলাকে তবে ওর চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো ওর বুদ্ধি আছে। ইচ্ছে করলে ও লেখাপড়া করতে পারবে।

দেখ কী করতে পারো, এলফ্রিডা বললো, দাঁড়াও আমি গিজলাকে ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে গিজলা বললো, কেমন আছো সুশোভন?

খুব ভালো। তুমি কেমন আছো গিজলা ?

চমৎকার। কাল তোমার সংগে আলাপ করে আমি খুব খুশি হয়েছি—

সহজ ইংরেজীতে সুশোভন বললো, আমিও। তোমার মতো মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। তোমার সংগে আমার আবার কবে দেখা হবে গিজলা ?

আমি মোটে দুদিন ছুটি পাই। মংগলবার আর শনিবার—

সুশোভন বললো, অতো কম দেখা হলে তো চলবে না। তাহলে, সুশোভন হাসলো, আমি যা শেখাবো, তুমি সব ভুলে যাবে যে ?

কী করি বলো ? একটু ভেবে গিজলা বললো, ইচ্ছে করলে তুমি যে কোনোদিন দুপুরে এখানে আসতে পারো। মিসেস কোহেন সকাল নটায় চাকরি করতে বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন প্রায় সন্ধ্যে সাতটায়—

বাঃ, খুশি হয়ে সুশোভন বললো, তাহলে আমি তো রোজই তোমার সংগে দেখা করতে যেতে পারি ?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তোমার কলেজের কী হবে ?

সে ঠিক হবে এখন। তোমাকে ওসব কিছু ভাবতে হবে না। আমি খুব ভালো ছাত্র। পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট হই জানো না।

গিজলা হেসে বললো, স্নব !

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুশোভন একে একে গিজলার জন্যে অনেক বই কিনে ফেললো। ব্যাকরণ, সহজ ইংরেজীতে লেখা নানা গল্পের বই আর লণ্ডন রংগমঞ্চের সব কটি চলতি নাটক। ওকে সংগে নিয়ে থিয়েটারে গেল আর নাটকগুলি পড়ে বুঝিয়ে দিলো

কোন নাট্যকারের কী বিশেষত্ব। গিজলার সংগে যখন তার দেখা হয় তখন সে শুধু এমনি নানা আলোচনা করে। ভুলেও একটি অবান্তর কথা বলেনা। গিজলা যখন কিছু বলতে যায় তখন সুশোভন কৌশলে কথা এড়িয়ে যায়। তার ভয় হয় ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা এসে পড়লে আর কোনো কাজ হবেনা। ব্যর্থ হবে তার পরীক্ষা।

একদিন দুপুর বেলা জেরাডস্‌ক্রশের বাড়িতে বসে গিজলা সুশোভনের খুব কাছে সরে এসে বললো, আমার জন্যে তুমি এতো সময় নষ্ট কর কেন? তোমার কি অন্য কোনো বন্ধু নেই।

না, সুশোভন হেসে নিজের ঘাড় থেকে গিজলার হাত আস্তে সরিয়ে দিয়ে বললো, আগেই তো বলেছি আমি ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। পড়াশুনো ছাড়া অন্য কিছু করবার আমার সময় নেই।

তাহলে আমার জন্যে এতো কর কেন?

এই তো আমার কাজ। দেশে ফিরে আমি লোককে লেখা-পড়া শেখাবো।

কিন্তু শুধু পড়াশুনো নিয়ে তুমি থাকো কেমন করে?

পড়াশুনা করলে দেখবে আর কিছুর দরকার হয় না গিজলা—

আশ্চর্য মানুষ তুমি, সুশোভনের বুকে মাথা রেখে খুব আস্তে গিজলা বললো, আমাকে ভালোবাসো না তুমি?

সুশোভন বললো, আজ তুমি বড়ো বাজে কথা বলছো—এমন করলে লেখাপড়া করবে কখন?

তুমি তো আমাকে এর মধ্যে অনেক শিখিয়েছো! দেখ না আজকাল আমি কতো ভালো ইংরেজী বলি?

আরও ভালো বলতে হবে—আরও অনেক কিছু তোমাকে শিখতে হবে গিজলা—

পরে শিখবো, ছোটো মেয়ের মতো গিজলা বললো, আজ ও সব ভারী কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

তাহলে কী করতে চাও এখন ?

চলো পাশের পুকুরে গিয়ে তোমার সংগে সাঁতার কাটি ?

আমি সাঁতার জানি না।

আমি শিখিয়ে দেবো, কিছু ভয় নেই।

না আজ থাক। তোমাকে আমি আজ একটা নাটক পড়ে শোনাবো ঠিক করেছি। যদি তোমার শোনবার ইচ্ছে না থাকে তাহলে তুমি সাঁতার কাটতে যাও, আমি বাড়ি ফিরে পড়াশুনো করি ?

দূর, তুমি আমার জন্যে এসেছো, আমি তোমাকে ফেলে যাবো কেমন করে ? আমি তোমার সংগে সাঁতার কাটতে চেয়েছিলাম। আজ বড়ো গরম পড়েছে কিনা !

অনেক দিন সুশোভনকে ক্লাশে দেখতে না পেয়ে একদিন হঠাৎ প্রফেসার হ্যারল্ড লাসকি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুশোভন ক্লাশ করে না কেন ? কী হয়েছে তার ?

বলতে পারি না স্যার। আমার সংগেও বহুদিন দেখা হয় নি।

যদি তোমার সংগে দেখা হয় তাহলে তাকে বলো একবার যেন আমার সংগে দেখা করে— একটু দরকার আছে।

নিশ্চয়ই বলবো স্যার।

যাক একটা ছুতো পাওয়া গেল। আমি সেই দিনই সুশোভনকে ফোন করে বললাম, লাসকি একটা বিশেষ দরকারী কথা তোমায় জানাতে বলেছেন।

সুশোভন বললো, ফোনে বল ?

ফোনে বলা যায় না। সে অনেক কথা।

তবে লিখে জানাও।

আমি বেশ রেগে কঠিন স্বরে বললাম, ছেলেমানুষী করো না সুশোভন। ভুলে যেওনা এ লাসকির কথা। তুমি তার প্রিয় ছাত্র।

অনেক সাধ্য সাধনার পর কাল বিকেল পাঁচটায় সুশোভন আমাকে তার সংগে দেখা করতে বললো। লাসকিকেও সে আজকাল গ্রাহ্য করেনা। একটা অতি সাধারণ মেয়ের এতো ক্ষমতা! ঠিক করলাম কাল দেখা হলে তাকে দুকথা শুনিয়ে দেবো।

ঠিক তেমনি আছে সুশোভন। শুধু মনে হ'লো তার গাম্ভীর্য যেন একটু কমেছে। আর বইএর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। ইকনমিক্সের বই নয়—কবিতা গল্প নাটক ও উপন্যাস। ইংরেজীতে অনূদিত ফরাসী জার্মানী আর নানা দেশের বই দেখলাম। বহু ইংরেজী নাটকও রয়েছে তার টেবিলে। বুঝলাম খুব থিয়েটার দেখানো হচ্ছে গিজলাকে।

লাসকি কী বলেছেন বলো?

তাঁর সংগে তোমাকে দেখা করতে বলেছেন—বিশেষ দরকার।

কী দরকার?

আমি তা কেমন করে জানবো?

একথাটা তো ফোনে জানালেই পারতে।

আমি রেগে বললাম, তোমার সংগে কি একদিন দেখা করতে পারি না আমি? কী এমন মহা কাজে ব্যস্ত থাকো আজকাল?

সুশোভন আমার কথার উত্তর দিলো না। নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবে দেখা করবে বলো?

করবো একসময়। এতো ব্যস্ত হবার কী আছে?

সুশোভন, হঠাৎ যেন আমার সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে গেল, এতো অধঃপতন তোমার হয়েছে যে তুমি আজকাল প্রফেসার লাসকির সংগেও দেখা করবার সময় পাওনা?

চেঁচাচ্ছো কেন? অবাক হয়ে সুশোভন বললো, অধঃপতন বলতে কী বুঝছো তুমি? আমি এখন অনেক বড়ো কাজ নিয়ে মেতে আছি—

অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছো।

তোমার তা মনে হতে পারে কিন্তু আমার হয় না।

আমি আরও জোরে বললাম, তুমি কি মনে কর ওই একটা মূর্খ সাধারণ মেয়ে তোমার মূল্য বুঝবে?

তা জানি না, একটু থেমে সুশোভন বললো, আমি কিন্তু ওর মূল্য বুঝেছি।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ওর কোনো মূল্য নেই। তুমি আবার বুঝবে কী?

সুশোভন হেসে বললো, সকলের পক্ষে সব কথা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু সেকথা থাক।

তুমি ওর প্রেমে পড়েছো নাকি?

সুশোভন আবার হাসলো, কী মনে হয়? আমাকে উত্তর দেয়ার অবসর না দিয়ে ও বলে চললো, গিজলাকে আমি লেখা-পড়া শেখাবো।

হো হো করে হেসে আমি বললাম, তুমি কি মনে কর ব্যালের

একটা মূর্খ মেয়েকে সত্যি শিক্ষিত করে তুলবে ?

হ্যাঁ, গম্ভীর হয়ে সুশোভন বললো, আর এটা হলো আমার ক্ষমতার পরীক্ষা। ফিরে গিয়ে ভেবেছিলাম প্রফেসার হবো। তাই দেখতে চাই আমার ক্ষমতা কতো দূর !

ওর ঘরের বইগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, এসব বই ও পড়েছে ?

সমস্ত।

কিছু বুঝেছে ?

নিশ্চয়ই। বুঝিয়ে দেবার জন্যে তো আমিই আছি। ভালো ইংরেজী না জানা ওর পক্ষে মোটেই লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বইএর মূল সুর বুঝিয়ে দিলে বুঝবে না কেন ?

ও আধুনিক নাটক পড়তে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবাক হয়ে সুশোভন বললো, তুমি কেমন করে জানলে ?

আমি হেসে বললাম, ওসব আমরা জানি। চলতি নাটকগুলো দেখে ভালো করে বুঝতে হবে তো। থিয়েটার দেখানো বন্ধ করে শুধু নাটক পড়াও তাহলে কাল থেকে ও আর আসবে না সুশোভন।

সুশোভন বললো, আমি স্বীকার করছি, থিয়েটার দেখানো বন্ধ করলে, হয়তো গিজলা আর না-ও আসতে পারে। কিন্তু আমি তা করতে যাবো কেন ? অধ্যাপকের প্রথম কাজ হলো মনস্তত্ত্ব বোঝা। ওকে আস্তে আস্তে ওপরে তুলতে হবে। খুব সাবধানে ওর মনের গঠন বদলাতে হবে।

কিন্তু এতো কাণ্ড করে তোমার লাভ কী ?

অধ্যাপক লাভ লোকসানের হিসেব করে না। শিক্ষা দেয়াই তার কাজ—তার আনন্দ।

আর তোমার নিজের আসল কাজ? ক্লাশে কতোদিন যাওনি সে-খেয়াল আছে?

আর হয়তো নাও যেতে পারি। এখন আমি যে কাজ পেয়ে গেছি বিলিতি ডিগ্রির চেয়ে সে-কাজ অনেক বড়ো—

সে কী? তুমি পরীক্ষা দেবে না?

ঠিক বলতে পারি না।

সুশোভন, আমি কঠিন স্বরে বললাম, ভীমরতি লোকের একটা বিশেষ বয়সে ধরে বলে জানতাম। কিন্তু তুমি কি এই করতে বিলেতে এসেছো? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, লণ্ডন ইস্কুল অব ইকনমিক্সে সমস্ত ভারতীয় সমাজের গৌরব—

থামো থামো।

কিন্তু আমি বলে দিলাম ও মেয়ে তোমাকে ছেড়ে পালাবেই —তখন কী করবে?

ওকে যদি শিক্ষিত করতে না পারি তাহলে দেশে ফিরে প্রফেসার হতাম কোন সাহসে?

কিন্তু তুমি পাত্র-অপাত্রের কথা ভাবছো না কেন?

শিক্ষা জাত বিচার করে না। আমি যদি কৃতকার্য না হই, সেটা আমার দোষ, গিজলার নয়। তাহ'লে বুঝতে হবে ওর মনস্তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। যাদের উৎসাহ আছে তাদের শিক্ষা দিতে সবাই পারে। আমি প্রমাণ করতে চাই যাদের উৎসাহ একেবারেই নেই, অধ্যাপকের ক্ষমতা থাকলে সে-উৎসাহ অনায়াসেই সৃষ্টি করা যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গিজলার মনস্তত্ত্ব কতদূর বুঝলে?

সুশোভন আমার স্বরে শ্লেষের সঙ্কেত পেয়ে বললো, দেখ ঠাট্টা করা সোজা কিন্তু কাজ করা কঠিন। গিজলাকে যদি আমি শিক্ষিত করে তুলতে পারি সেটা আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা, যদি না পারি সেটা সব চেয়ে বড়ো পরাজয়—

আমি বিস্মিত হ'য়ে শুধু বললাম, সুশোভন তুমি পাগল।

সুশোভন প্রফেসার লাসকির সংগে দেখা করেছিলো কিনা জানি না। কেননা কয়েক দিনের মধ্যে হঠাৎ লাসকি মারা গেলেন। তাঁর প্রত্যেকটি শোকসভায় আমি গেছি কিন্তু কোথাও সুশোভনকে দেখি নি। হয়তো সে তখন কোনো থিয়েটারে ব'সে গিজলাকে ট্র্যাজিডি আর কমিডির প্রভেদ বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সেই থেকে সুশোভনের সংগে আমিও আর দেখা করবার চেষ্টা করতাম না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। শুধু এই ভেবে আমি অবাক হলাম সুশোভনের মতো বুদ্ধিমান ছেলে কেমন করে গিজলার মতো মূর্খ মেয়ের জন্যে এক কথায় সব বিসর্জন দিলো! রূপে কি সত্যিই মানুষকে এমন দিশাহারা করে!

যাহোক আমার কথা যখন সে শুনবে না তখন ভেবে দেখলাম আমার পক্ষে সরে যাওয়াই ভালো। আশা করি নিজের ভুল বুঝতে ওর মতো লোকের বেশি দেরি হবে না। আমি পড়াশুনো আর নিজের নানা কাজ নিয়ে মেতে উঠলাম।

সারা দিন রাত সুশোভন আজকাল গিজলার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা করে। সে নিজে এর মধ্যে জার্মান ভাষাও কিছু কিছু শিখে নিয়েছে। মনে মনে সে যতোই ঠিক করুক কাজের কথা

ছাড়া গিজলার সংগে একটিও অবান্তর কথা বলবে না তবু হঠাৎ যেন তার নিজের অজ্ঞাতে ঝর্ণার প্রচণ্ড তোড়ের মতো আজে বাজে কথা বেরিয়ে আসে।

মংগলবার আর শনিবার গিজলা লণ্ডনে এসে নিয়মিত সুশোভনের সংগে দেখা করে। আর তাছাড়া দুপুরে সুশোভন প্রায়ই জেরাডস্‌ক্রশে যায়। সন্ধ্যেবেলা মিসেস কোহেন আর তার স্বামী ফেরবার আগে সে লণ্ডনে চলে আসে।

গিজলা সুশোভনের বাড়ি এসে পৌঁছোয় দুটো আড়াইটার সময়। সন্ধ্যে অবধি সুশোভন ওকে নানা কথা শোনায়, অনেক আলোচনা করে। তারপর হয় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, নয় থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে যায়। তারপর খাওয়া দাওয়ার পর রাত এগারোটার সময় জেরাডস্‌ক্রশের শেষ ট্রেনে সুশোভন গিজলাকে তুলে দেয়।

সেদিন ছিলো শনিবার। ওরা ভেবেছিলো আজ দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল হলেও সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। কখন আকাশ পরিষ্কার হবে বলা কঠিন। ঠিক দুটোর সময় গিজলা সুশোভনের ঘরে এলো। নীল রঙের রেইন কোট পরেছে ও।

স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে গিজলা বললো, কী বিশ্রী দিন ! ঠিক শনিবার এমনি করে বৃষ্টি পড়বার কী দরকার ছিলো !

সুশোভন হাসলো, আমিও ঠিক সেকথা ভাবছিলাম।

রেইন কোট না খুলে খাটের ওপর সুশোভনের পাশে বসে গিজলা বললো, আজ তোমার সংগে হ্যাম্পটন কোর্ট দেখতে যাবো ভেবেছিলাম।

আজ কোথাও যেতে চাও গিজলা ?

না না, এমন বিশ্রী দিনে আমি পথ চলতে চাই না। আজ কোথাও যেতে চাই না—তোমার এখানে বসে থাকবো এখন থেকে রাত এগারোটা অবধি।

তাই থাকো, কিন্তু রেইন কোট খুলছো না কেন? এসো তোমাকে সাহায্য করি?

খুব আস্তে আস্তে সুশোভনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গিজলা বললো, কর।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুশোভন। তারপর বললো, কী আশ্চর্য নীল তোমার চোখ! রেইন কোটের সংগে তোমার চোখের রঙ কী অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছে!

সুশোভনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিজলা বললো, কিন্তু আমার চোখ ছাড়া আর কিছুই কি তোমার ভালো লাগেনা সুশোভন?

তোমার সব কিছুই আমার ভালো লাগে গিজলা।

কই সেকথা কখনও বল না তো, সুশোভনের মুখের কাছে মুখ এনে গিজলা বললো, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে আরও অনেক কিছু বলবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল আর একটি কথাও তুমি বললে না।

বাইরে তখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সুশোভন যেন নিজের অজ্ঞাতে গিজলাকে কাছে টেনে নিলো। ওর ইচ্ছে হলো তাকে এই মুহূর্তে বলে, এতো কথা তোমাকে আমার বলতে ইচ্ছে করে যে একবার আরম্ভ করলে আর শেষ হবে না। তাই ভয়ে বলি না। কারণ তাহলে আর সব চাপা পড়ে যাবে। শুধু আমার স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠবে।

সুশোভনের বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে গিজলা বললো, যেদিন তোমার সংগে প্রথম দেখা হয় সেদিন তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে, তোমার চোখ দুটো একেবারে নীল, তোমার সে-দৃষ্টি আমি কোনোদিনও ভুলবো না। কিন্তু তারপর তুমি যেন কেমন হয়ে গেলে। আমি যতোবার তোমার কাছে আসতে চাইলাম, তুমি ততোবার ঠেলা মেরে দূরে সরিয়ে দিলে। কেন তুমি আমার সংগে এমন ব্যবহার কর সুশোভন ?

কেন ? গিজলার মুখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন বললো, তোমার চোখের প্রশংসা করা ছাড়া আলাপের প্রথম দিন তোমাকে আমি আর কী কথা বলেছিলাম গিজলা ?

কী ?

বলেছিলাম কেমন করে শোকে দুঃখে স্থির থাকতে হয় আমি তোমাকে সে-মন্ত্র বলে দেবো। তোমাকে যে কথা দিয়েছি সে কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না।

জানি, কিন্তু তুমি তো নিয়ম করে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছো —

আমি তাই শিখিয়ে যাবো গিজলা। আর যতো শিগগির হয় তোমাকেও মন দিয়ে আমার কাছ থেকে সব শিখে নিতে হবে।

আমি তো শিখছি। কিন্তু—

থামলে কেন ? বল ?

আমার জন্যে তুমি এতো পরিশ্রম করছো, আমি তোমার জন্যে কী করবো ?

আমার সংগে যেমন দেখা করছো তেমন সারা জীবন দেখা করবে।

গিজলা হেসে বললো, কী বললে? সারা জীবন?

হ্যাঁ।

তুমি বড়ো ছেলে মানুষ সুশোভন।

সুশোভনও হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেন বল তো?

একটু গম্ভীর হয়ে গিজলা বললো, সারা জীবনের কথা আমি আজকাল আর ভাবতে পারি না।

কেন?

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলো গিজলা। সুশোভনের কথায় উত্তর দিতে পারলো না। তারপর মাথা তুলে এক সময় হঠাৎ বললো, আমি এমন একটা দেশ থেকে আসছি সুশোভন যেখানে কাল কী ঘটবে লোকে আজ তা জানে না। তাই সারা জীবনের কথা ভাবলে এখন আমার হাসি পায়।

সুশোভন বললো, আমি জার্মানী যাইনি। খবরের কাগজে যা প্রকাশিত হয়, তা থেকে তোমাদের দেশ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করতে পারি। কিন্তু তোমার মুখ থেকে সেখানে তোমাদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে চাই। বল গিজলা তোমার দেশের বর্তমান অবস্থা কেমন?

ভাষায় আমি সেকথা তোমাকে বোঝাতে পারবো না, গিজলা বললো, তুমি নিশ্চয়ই একদিন জার্মানীতে যাবে সুশোভন। কিন্তু এখন কিছুতেই যেওনা। এখনকার অবস্থা কল্পনা করা যায় না—চোখে দেখা যায় না।

আমি সেকথা জানি।

সুশোভনের কাছ থেকে সরে এসে রেইন কোট খুলে খাটের ওপর বসে গিজলা বললো, আজকাল কারোর ওপর আমার কোনো রকম মমতা জাগে না—জাগতে পারে না। কেননা

এখন মোটে কুড়ি বছর বয়স আমার। কিন্তু আমি কিছুই পাইনি, জীবনের কিছুই দেখিনি। হয়তো আর কোনোদিন কিছু দেখতে পাবো না।

সব দেখতে পাবে গিজলা, তার পাশে বসে মৃদুস্বরে সুশোভন বললো, আমি সব বুঝতে পারি। পৃথিবীর এমন বীভৎস অবস্থা বেশি দিন থাকবে না—থাকতে পারে না। আমি তোমাকে বলে দিলাম।

গিজলা বেশ জোরে হেসে উঠলো, তোমার এই পুরু গদিতে বসে এমন আশ্বাস দেয়া খুব সোজা, গিজলার নীল চোখ হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো, কিন্তু ভাবতে পারো সুশোভন, মাত্র আঠারো বছর বয়সে এক টুকরো রুটির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ'এ দাঁড়িয়ে থেকেছি। কিন্তু শেষ অবধি পাইনি। আমেরিকানরা তখন সামনে বসে ফেলে ছড়িয়ে ভালো ভালো খাবার খেয়েছে আর আমার রূপ যৌবন দেখে কুৎসিৎ ইংগীত করেছে। তাদের ডাকে যখন সাড়া দিয়েছি তখনই শুধু খেতে পেয়েছি, সুশোভনের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিজলা থেমে থেমে বললে, আমার বয়স তখন মোটে আঠারো।

সুশোভন কী বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে গিজলা আবার বললো, তুমি বড়ো লোক, পড়াশুনো করে অধ্যাপক হবার জন্যে এদেশে এসেছো, আর আমি ? গিজলা হেসে বললো, আমি এসেছি পেটের দায়ে। ঝি গিরি করে শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে। না এলে কিছুতেই চলতো না। কারণ আমাকে আর একদিনও খেতে দেবার সামর্থ্য মা বাবার ছিলো না। কে ভেবেছিলো মিসেস কোহেনের গালাগাল আমি এমন করে দিনের পর দিন সহ্য করবো ?

বিস্মিত হয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, উনি তোমাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করেন নাকি ?

খুব খারাপ ব্যবহার করেন। আর আমাদের কোনো উপায় নেই বলে দিনরাত খাটিয়ে নেন। যে কাজ আমাদের করবার কথা নয় তাও করতে বলেন।

সুশোভন বললো, এদেশে কারোর ওপর কেউ অমন অন্যায় আচরণ করতে পারে নাকি ? তোমরা প্রতিবাদ করলেই তো পারো ?

গিজলা বললো, ইচ্ছে মতো মানুষ কি সব কাজ করতে পারে ? একটু চুপ করে থেকে ও বললো, কতোবার আমার স্টেজের উপর ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই কল্পনা করি, অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে, লোকে লোকে ভরে গেছে প্রেক্ষাগৃহ, আমার শরীর লীলায়িত হয়ে উঠেছে আশ্চর্য মধুর ভংগিতে, যতোবার স্টেজে আসছি ততোবার দর্শকের অবিরাম হাত তালি পাচ্ছি, গিজলার চোখ সজল হয়ে উঠলো, কিন্তু হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়। মিসেস কোহেনের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনি, এমন অপদার্থ জার্মান মেয়ে রাখা শুধু পয়সা নষ্ট করা। এই গিজলা, কোথায় গেলে তুমি ? ছেলেটা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছো না ? দিনরাত ঘুমোও কেন বসে বসে ? জার্মানরা যে এতো অপদার্থ হয় তা জানলে কে ভাড়া দিয়ে নিয়ে আসতো ? ফ্রান্স ইটালী কিংবা সুইটজারল্যাণ্ডের মেয়েরা অনেক ভালো হয়—সব কথা আমার কানে যায় না, আমি বাচ্চাকে ধরে আনবার জন্যে রাস্তায় ছুটে যাই।

এ কাজ ছাড়া তুমি কি অন্য কোনো কাজ করতে পারো না গিজলা ?

না, এদেশে জার্মান মেয়েরা আর কোনো ভদ্র কাজ করতে পারে না।

কিন্তু শুনেছি এখানে জার্মান সরকারের একটা আপিস খোলা হয়েছে। একটু চেষ্টা করলে তুমি তো সেখানে একটা কাজ পেতে পারো?

দূর, গিজলা হেসে বললো, আমাকে দিয়ে ওদের কী সুবিধা হবে? ওরা লেখাপড়া জানা মেয়ে চায়। সরকারের আপিসে ব্যালেরিণার জন্যে কোনো কাজ নেই—কখনও বোধহয় থাকে না।

এখানে কোনো ব্যালের দলে তো ভর্তি হলে পারো?

তা হয় না। বললাম যে এখানে বাড়ির কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করবার উপায় আমাদের নেই, বেশ জোরে গিজলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, ব্যালের কথা মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো আমার মনে হয় বটে কিন্তু ও কথা ভাবতে আর আমি তেমন উৎসাহ বোধ করি না সুশোভন।

কেন? শান্ত স্বরে সুশোভন প্রশ্ন করলো।

কারণ ও করে আমার তো পেট ভরবে না। কী করে আমি শান্তি পাবো তা ভাবলে এখন আমার চলবে না। আমাকে সব চেয়ে আগে ভাবতে হবে কী করলে আমি শুধু আমার নিজের খাবার জোটাতে পারবো, বিষন্ন হাসি হেসে গিজলা বললো, তাই ব্যালেরিণা গিজলা আজ মরে গেছে।

সুশোভন বললো, তোমার কথা আমি খুব বুঝতে পারছি গিজলা। তবু একটা কথা না বলে পারছি না যে আজ নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝে পড়ে ব্যালেরিণা গিজলা মরে গেলেও তেমন প্রতিভা থাকলে যে আবার আগের মতোই বেঁচে উঠবে।

সে বিশ্বাস আমারও আছে, অদ্ভুত আত্ম বিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ

গিজলার মুখে ফুটে উঠলো, শুধু আমার নয়, আমার সমস্ত দেশের। জার্মানদের আজ আর কিছু নেই, তাদের সমূলে বিনাশ করবার জন্যে শত্রুপক্ষ সব কৌশল সব শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু সব কিছু হারালে মানুষ যেমন নিঃস্ব হয় তেমন শক্তিমানও হয়ে ওঠে। কারণ তার তখন আর কোনো কিছু হারাবার ভয় থাকে না, লজ্জা সঙ্কোচও বোধহয় থাকে না। তাই একমাত্র মনের জোরের ভরসায় কোনো কাজ করতে দ্বিধা হয় না তার। আজ জার্মানীর আর কিছু নেই, কিন্তু আমি নিজেকে দিয়ে জানি, তার আছে অলৌকিক মনের জোর—

গিজলার কথা শুনতে শুনতে সুশোভন অবাক হয়ে গিয়েছিলো। সে জানতো না গিজলা এমন করে নিজের জাতকে বিশ্লেষণ করতে পারে। তাই মুগ্ধ হলো সে। ভাবলো, এসব কথা যে এমন করে ভাবতে পারে জীবনের কোনো অবস্থাতে বোধহয় সে একেবারে ভেঙে পড়ে না। অদ্ভুত মনের জোর দিয়ে বিরুদ্ধ অবস্থার সংগে আজীবন সংগ্রাম করতে পারে।

গিজলার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে সুশোভন বললো, তোমার কথা শুনে আমি নিজেও ভরসা পাচ্ছি গিজলা। আমি বিশ্বাস করি, সত্যি, পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমাদের কিছুতেই চিরকালের জন্যে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দৃঢ়স্বরে গিজলা বললো, কিছুতেই না। যখন যেখানেই থাকো, তুমি দেখে নিও জার্মানী আবার একদিন মাথা তুলবে—আমরা আবার ভালো ভাবে বাঁচবো।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বৃষ্টি ধরেনি তখনও। দেশের কথা মনে হলেই গিজলা সব কিছু ভুলে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। জল ভরে ওঠে তার চোখে। সুশোভন লক্ষ্য করলো তার চোখ

বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে রুমাল বের করে তার চোখের জল মুছে দিলো।

বিলেতে আসবার আগের দিন অবধি সুশোভন ভাবতে পারেনি যে কোনো বিশেষ একজন তার জীবনে এমন করে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ভালো করে জ্ঞান হবার পর থেকে আজ অবধি কোন মানুষকে নিয়ে কখনও সে ব্যস্ত হয় নি।

অনেকে আছে হাজার হাজার কাজের মাঝেও যারা অপরিচি-তার মৃদু সঙ্কেত পায়, অজানার পদধ্বনি শোনে। আর ভাবে একদিন কেউ না কেউ হঠাৎ কোথা থেকে এসে তাদের সব ক্লান্তি সব অবসাদ মুছিয়ে দেবে।

সুশোভন তেমন কোনো ইংগিত কখনও পায় নি। নিজের পৃথিবীতে নিজেকে সে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলো। সেখানে বোধ হয় আর কারোর প্রবেশের অধিকার ছিলো না।

বাড়িতে চিরদিন সে শান্তিতে কাজ করেছে। কারোর কাছ থেকে কোনো বাধা পায়নি। সুশোভন এমনি মানুষ যে সে যখন যেখানে গেছে সেখান থেকে শ্রদ্ধা পেয়েছে, স্নেহ পেয়েছে। সকলেই তাকে ভালোবেসেছে। কারণ ছোটোখাটো পাওনা নিয়ে সে কখনও কলহ করে নি, ছোটো ব্যাপার নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। কেউ তাকে তেমন করে আকর্ষণ করে নি বটে কিন্তু কাউকে সে অশ্রদ্ধাও করেনি। যখন যে তার কাছে এসেছে সে তখন তাকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছে। সুশোভন জীবনকে দেখেছে ব্যাপক ভাবে। বয়স কম হলেও তার চেহারায় এমন একটা করুণ গাম্ভীর্যের ছাপ আছে যে তাকে দেখলে ভক্তি না করে পারা যায় না। অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে তার আত্মীয়

অভিভাবকরা সব সময় তার সংগে সসম্ভ্রমে কথা বলেছে। কেননা তার চেহারা দেখেই লোকে বুঝে নেয় যে কোনো অন্যায় করবার মানুষ এ নয়। তাই তার কোনো কাজে কখনও কেউ বাধা দেয় নি।

অবশ্য বাধা পাবার মতো কাজ সুশোভন কখনও করে নি। সে শুধু পড়াশুনো করেছে। তার মন গেছে এ বই থেকে ও বইএ, এ খাতা থেকে ও খাতায়। জীবনের অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এতোদিন তার হয়নি।

দেশে শান্ত পরিবেশে সে কাজ করে এসেছে। কারোর কাছ থেকে কোনো বাধা আসেনি। মা মারা যান ছেলেবেলায়। তাদের পরিবারে লোকের সংখ্যা খুব কম। শুধু বাবা, দাদা আর বৌদি। দাদা তার চেয়ে দশ বছরের বড়ো।

বৌদি কিছুদিন কলেজে পড়াশুনো করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সুশোভনের সংগে এসে নানা রসিকতা করবার চেষ্টা করতেন। যতোক্ষণ তিনি সামনে থাকতেন ততোক্ষণ সুশোভন তাঁর কথা শুনে হাসতো, রসিকতাও উপভোগ করতো। কিন্তু বৌদি বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে কথার রেশও যেন মিলিয়ে যেতো। সে ভেবে পেতো না কেমন করে মানুষের জীবনে প্রেমের সমস্যা আর সব কিছু ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে ওঠে।

বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। দাদাও তাই। পয়সার অভাব নেই সুশোভনের। বাবা দাদা শেষ অবধি ভালো করে পড়াশুনো করতে পারেন নি। তাই বাড়িতে সুশোভনের আলাদা খাতির ছিলো। এবং পরীক্ষায় সে যখন আশাতিরিক্ত ভালো করতো তখন গর্বে যেন বাড়ির লোকের বুক ফুলে উঠতো। তার সুখ সুবিধার দিকে লোকে আরও প্রখর দৃষ্টি রাখতো।

শুধু বাড়িতে নয়, বাইরেও সুশোভনের খাতির কম ছিলো না। অন্যের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার সংগে লোকে গর্বের সংগে বলতো, রেকর্ড মার্কস্ পাওয়া ছেলে!

ঘরে বাইরে এমনি প্রশংসা পেতে পেতে নিজের অজ্ঞাতে সুশোভন যেন কেমন অদ্ভুত স্বার্থপর হয়ে উঠলো। ব্যক্তিগত প্রশ্ন কিংবা সংসারের অন্য কোনো আলোচনায় তার মনের সায় থাকতো না। বন্ধুর একমাত্র বোনের টাইফায়েড ভালো হলো কিনা, হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় কার কতোটা অসুবিধা হলো, কে একশো দুই জ্বর নিয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যে পরীক্ষা দিলো—এসব খবর মন থেকে কখনও নিতে পাবতো না সুশোভন।

বস্তুত, জীবনের এমনি নানা অসুবিধা কিংবা দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ তার মনে দাগ কাটতে পারতো না। কেন মানুষ এসব ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হয় তা ছিলো সুশোভনের ধারণাব বাইরে। তার অনেক চেনা শোনা ছেলে যখন কোনো মেয়ের জন্যে দিশা হারাতো কিংবা তাকে পাবার জন্যে সব কিছু তুচ্ছ করে তপস্যা করতো তখন সুশোভন অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতো, কেন এমন হয়! বন্ধন মানুষের কাছে এতো বড়ো হয়ে ওঠে কেমন করে। থেকে থেকে এ সংসার তার ছায়ার মতো মনে হয়।

তার আরও মনে হয়, বেঁচে থাকতে হলে জীবনে অনেক আঘাত আসে—এ তো জানা কথা। কিন্তু তা সহ্য করতে পারে না কেন মানুষ। মানুষের সব বিচার বুদ্ধি থেকে থেকে আচ্ছন্ন হয়ে যায় কেন।

বিলেত যাওয়া যখন ঠিক হয়ে গেল তখন এতোটুকু [illegible]

জাগলো না সুশোভনের শরীরে। এ ক্লাশ থেকে ও ক্লাশে গেলে তার মনের অবস্থা যেমন হয়—এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো।

কিন্তু রসিকতা করবার সুযোগ ছাড়লেন না বৌদি, আবার ফিরে আসবে তো ঠাকুরপো ?

কিছু না বুঝতে পেরে সুশোভন ভালো মানুষের মতো উত্তর দিলো, কেন আসবো না বৌদি ? কাজ শেষ হয়ে গেলেই ফিরে আসবো।

বৌদি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, কাজের কথা আমি বলছি না ঠাকুরপো। কাজ তোমার শেষ হবে জানি। কিন্তু শেষ অবধি যদি সেখানকার বন্ধন না কাটাতে পারো ?

সুশোভন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কিসের বন্ধন বৌদি ?

বৌদি হেসে বললেন, মায়ার বন্ধন। এদেশে তো চোখ কান বুজে কাটালে—কিছুই বুঝলেনা, কারোর দিকে তাকিয়ে দেখলে না। আশা করি ওদেশে গিয়ে তোমার দৃষ্টি খুলে যাবে।

সুশোভন বললো, আমি অন্ধ নই বৌদি। আমি সব দেখতে পাই। তাই বিদেশে গিয়ে দৃষ্টি পাবার কোনো কারণ নেই।

কিছু দেখতে পাওনা তুমি, সুশোভনের কাছে সরে এসে বৌদি বললেন, এটা ঠিক যে তোমার মতো এমন আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছাত্র আমি আর কখনও নিজের চোখে দেখিনি বটে কিন্তু আরও অনেকের কথা শুনেছি। তারা কিন্তু কেউ তোমার মতো নয় ঠাকুরপো।

সুশোভন মনে মনে খুশি হয়ে হেসে বললো, আমার তুলনা আমি। আমার জুড়ি তুমি সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাবে না বৌদি।

তা জানি, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৌদি বললেন, আরও

জানি তোমার এ অহঙ্কার একদিন চূর্ণ হবে। সেদিন তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে।

আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আর তাইতো সকলের কাছ থেকে নিজেকে এমন বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছি। আমি কাউকে চাই না। কোনো মানুষের সামান্য অত্যাচার সহ্য করবার ক্ষমতা নেই আমার।

বৌদি বললেন, না সুশোভন, আজও তুমি নিজেকে খুঁজে পাও নি। যে মানুষ সত্যি নিজেকে খুঁজে পায় সে কখনও আর পাঁচ জনের কাছ থেকে নিজেকে তোমার মতো এমন আড়াল করে রাখতে পারে না। সে হৃদয় দিয়ে আর পাঁচজন মানুষের সুখদুঃখের ভাগ নেয়।

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন হেসে বললো, আমার সময় নেই। আমার সময় বড়ো কম বৌদি। তাছাড়া পাঁচজনের মধ্যে আমি নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, পড়াশুনো করা ছাড়া আর কিছু আমার করতে ভালো লাগে না। কারোর সংগে পড়াশুনোর আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

বৌদি বললেন, তাতো দেখতেই পাই, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, আমরা কেউ মরে গেলেও বোধহয় তোমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়বে না।

সুশোভন আবার হাসলো, শোক প্রকাশের রীতি সকলের এক রকম নয় বৌদি। হয়তো আমি ডাক ছেড়ে কারোর জন্যে কাঁদতে পারবো না, কিন্তু যাকে চিনি, যাকে জানি, যাকে প্রত্যহ দেখি, সে যদি না থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার অভাব বোধ করবো। তবে সে-অভাব বোধ শুধু আমার নিজের মনেই থাকবে।

বৌদি বললেন, দেখা যাক বিলেত থেকে ফিরে এসেও তুমি ঠিক এক রকম থাকো কি না।

সুশোভন বললো, সেখানকার মানুষ শুনেছি আরও চাপা স্বভাবের। কাজেই মনে হয় ওখানে গিয়ে আমার খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।

দেখা যাক। সে কথা এখন ভেবে লাভ নেই। তবে শুনি নতুন দেশে গিয়ে নতুন লোকের মাঝে পড়ে নতুন উপলব্ধি হয়—

সুশোভন বললো, তা তো হবেই।

তুমি যেমন করে দিন কাটাও তেমন করে তো গোটা জীবন কাটাতে পারো না। বয়সের সংগে সংগে তোমার ধারণার আগাগোড়া পরিবর্তন হবে নিশ্চয়ই।

সুশোভন উত্তর দিলো না। হাসিমুখে চুপ করে বসে রইলো। এই পৃথিবীতে বৌদি বোধহয় একমাত্র মানুষ যাঁর সংগে মাঝে মাঝে সুশোভন এমন অবান্তর কথা বলে। তাও নিজের থেকে কথা বাড়ায় না। বৌদি কথা তুললে সে শুধু জবাব দেয়।

বাড়ির সকলে যে তাকে বেশ স্বার্থপর মনে করে সে কথা সুশোভন জানে। কিন্তু তার জন্যে কোনো সঙ্কোচ নেই তার। বরং সে এদের সকলের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যেতে চায়। মাঝে মাঝে তার মনে হয় যদি পৃথিবীর সংগে তার সম্পর্ক না থাকতো, যদি একটি মানুষের সংগেও তার কথা বলতে না হতো তাহলে সে যেন বেঁচে যেতো—আপনার মনে সারাদিন সারা রাত সে শুধু তার নিজের কাজ করে যেতে পারতো। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে তার ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধকদের কথা মনে হয়। সকলকে বাদ দিয়ে, সংসারের সব আকর্ষণ এড়িয়ে তাদের মতো সুশোভনও শুধু কঠোর সাধনা করে যেতে চায়।

দাদার দিকে তাকিয়ে অনেক সময় সে অবাক হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, মানুষ কেমন করে এতো সহজে সংসারের ছোটো খাটো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারে। অন্য আর একজনের ওপর এতোখানি নির্ভর করতে পারে। আর কারোর ভাবনায় এতো বেশি সময় দিতে পারে। বস্তুত, বৌদিকে বাদ দিয়ে দাদা কিছু নয়। তাঁর মেজাজ বুঝে দাদাকে চলতে হয়। খুকির অসুখে ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করা, চাকর পালালে নতুন চাকরের সন্ধান করা, সংসারের কোনো অসুবিধা হলে বৌদিকে সব ব্যাপারে সাধ্যমতো সাহায্য করা—সবই দাদাকে করতে হয়। কিন্তু তার জন্যে দাদার মুখে সামান্য বিরক্তির রেখা কখনও ফুটে উঠতে দেখেনি সুশোভন। বরং দাদা হাসিমুখে সব সময় সব কাজ করে যায়। তার দিকে চেয়ে সুশোভন শুধু ভাবে সংসারের এমনি তুচ্ছ ভার বহন করবার জন্যে মানুষ কেন এত ব্যস্ত হয়। কী পায় তারা এ কাজগুলির মধ্যে ?

আর এক সন্ধ্যার কথা সুশোভনের আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন শীতকাল। সেদিন একটু বেশি শীত পড়েছিলো। সকাল থেকে কনকনে হাওয়া দিচ্ছিলো। ভিজে হাওয়া। বোধহয় দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সুশোভনের তেমন শীত কোনোদিনও লাগে না। আজও শীতের দোহাই দিয়ে সে কাজের অবহেলা করে নি। একমনে অর্থনীতির একটা জটিল অধ্যায় নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। আর কয়েক দিন পরেই তার পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষা না থাকলেও সুশোভন ঠিক এমনি করেই তার পড়ার টেবিলে দুহাত প্রসারিত করে বসে থাকতো।

হঠাৎ তার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। তীব্র কান্নার শব্দ ভেসে এলো পাশের ঘর থেকে। কী ব্যাপার ? কী হলো ?

এমন করে এ বাড়িতে কে কাঁদে ? তেমন কেউ তো নেই এখানে। বই বন্ধ করে কৌতূহলী হয়ে সুশোভন উঠে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত হাতে দরজা খুলে প্রায় ছুটে পাশের ঘরে এলো।

তেমন দৃশ্য সুশোভন আজ অবধি আর কেথাও কখনও দেখেনি। তার বৌদি কাঁদছেন। হাতে তাঁর খোলা একটা টেলিগ্রাম। ছেলে মেয়েরা ঘিরে রয়েছে তাঁকে। দাদা করুণ মুখে বৌদির পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বৌদি যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন। শাড়ি শ্লথ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, চুল আলু থালু।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে সুশোভন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দাদার পাশে এসে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ?

দাদা কোনো কথা না বলে বৌদির হাত থেকে টেলিগ্রাম সাবধানে টেনে নিয়ে সুশোভনের সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা রয়েছে, হঠাৎ হার্টফেল করে তুপুর তুটোয় বৌদির বাবা মারা গেছেন। তিনি এলাহাবাদে থাকতেন। কয়েক মাস ধরে শরীর ভালো যাচ্ছিলো না তাঁর। কিন্তু হঠাৎ যে এই সাংঘাতিক খবর আসবে তা কেউ আশা করেনি।

বৌদির করুণ অবস্থা সুশোভন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারলো না। যেমন করে এসেছিলো তেমন করে আস্তে আস্তে আবার নিজের ঘরে চলে এলো। বৌদির এমন চেহারা দেখে সে খুব বেশি অবাক হয়েছে। কেন মানুষ এমন করে দিশা হারায়। কেন শোকে এমন বিহ্বল হয়ে পড়ে ? সে নিজে এমন এক পৃথিবীতে বাস করে যেখানে আঘাত এতো তীব্র হয়ে পৌঁছোতে পারে না। সব কিছু সহ্য করবার ক্ষমতা আছে তার। যদি শোকে তুঃখে মানুষ অবিচল থাকতে না পারে তাহলে কী শিক্ষা

সে পেলো এতোদিন। প্রতিদিন শুধু জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু সুশোভনের কাম্য নেই। কোনোদিন কোনো ব্যাপারে সে বিচলিত হয় না, দিশা হারায় না। তার সামনে সব কিছু ভুলে কেউ যদি অধীর হয়ে পড়ে তাহলে সে শুধু অবাক হয়ে ভাবে, কেন এমন হয়!

বিলেতে আসবার আগে এদেশ সম্পর্কে সুশোভনের স্পষ্ট ধারণা ছিলো। এদের উচ্ছ্বাস কম, অন্যের ব্যাপারে এদের কৌতূহল কম, গায়ে পড়ে এরা কারোর সংগে আলাপ করে না, অকারণে অন্যকে অবান্তর প্রশ্ন করে বিরক্তির কারণ ঘটায় না— এসব কথা দেশে থাকতে সে ভালো করে জানতো।

তাই এদেশে এসে হঠাৎ যেন সে আরও বেশি কাজের মানুষ হয়ে উঠলো। এখানে সত্যি কেউ তেমন করে কারোর খবর নেয় না, জীবনের কোনো অঘটনেই ভেঙে পড়ে না, সকলেই যন্ত্রের মতো শুধু কাজ করে যায়। বেঁচে গেল সুশোভন। বহুদিন ধরে ঠিক এমনি পরিবেশ সে মনে মনে কামনা করেছিলো। বিনা প্রয়োজনে কারোর সংগে সে আলাপ করলো না, কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করলো না। বাইরের লোকজন রূপ রস গন্ধ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে পরম পরিতৃপ্তির সংগে সুশোভন নিজের ছোটো ঘরে বইএর সমুদ্রে ডুবে রইলো। ব্যস, আর কিছুর প্রয়োজন তার নেই।

কিন্তু এমন হবে কে জানতো! কে জানতো হঠাৎ এমন করে তার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। এ যে সুশোভনের ধারণার অতীত। তার সব কিছু ছাড়িয়ে কেন গিজলার ভাবনা বড়ো হয়ে উঠলো। কেন সারাদিন শুধু তাকে দেখতে ইচ্ছে করে আর এই কথা মনে করে বেদনায় তার মন ভরে যায় যে হাজার

অসুবিধার মাঝে গিজলার দিন কাটছে। তার যা করবার কথা সে-কাজ সে করতে পারছে না, দায়ে পড়ে তাকে তুচ্ছ কাজ করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কেন এমন হয়? কেমন করে গিজলাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে থেকে উদ্ধার করা যায়! সারাদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুশোভন সেই এক কথা ভাবে আর গভীর বেদনায় তার সারা বুক ভরে যায়।

এখন নিজের অতীতের কথা ভেবে লজ্জা করে সুশোভনের। সে স্বার্থপর বৈকি! তার মতো এমন আশ্চর্য স্বার্থপর বোধহয় খুব কমই আছে। কারোর কথা ভাবেনি সে। দরজা বন্ধ করে কাপুরুষের মতো শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। কারোর বুক ভাঙা ক্রন্দন তার কঠোর মনে সামান্য রেখাপাত করতে পারে নি। যদি সে অপরের দুঃখ বেদনার কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারলো তাহলে কী লাভ হলো তার দিনের পর দিন মোটা মোটা বই শেষ করে? নিষ্ঠুর সৈনিকের মতো এতোদিন সে যেন নীরস বইএর দুর্গে কোনোরকমে আত্ম-গোপন করে ছিলো! আজ হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে গেছে তার দুর্গদ্বার আর পথে বেরিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘকাল স্থায়ী গোধূলির শোভা উপভোগ করতে করতে তার কেবলই মনে হচ্ছে, কেন এমন করে এই পৃথিবীকে এতোদিন সে দেখতে পারে নি। আজ এগুলি তার বড়ো পরিচিত মনে হচ্ছে যেন। বৌদির ভাষায়, বিদেশে এসে সত্যি যেন তার দৃষ্টি খুলে গেছে। তাঁকে শিগগিরই একটা দীর্ঘ চিঠি লিখবে সুশোভন।

দেশের কথা মনে হওয়ার সংগে সংগে সুশোভন আবার সতর্ক হয়ে পড়ে। নিজেকে ধিক্কার দেয়। না, কিছুতেই এতো বড়ো প্রবঞ্চনা সে নিজের সংগে করতে পারবে না। সে যদি সব কিছু

বিস্মৃত হয়, গিজলাকে লেখাপড়া না শিখিয়ে, তাকে নতুন মানুষ করে না তুলে যদি নিজেকে তার কাছে প্রধান করে তোলে— তাহলে সে কতো ছোটো হয়ে যাবে নিজের কাছে। এতোদিন গিজলা যাদের দেখেছে তারা সকলেই হয়তো তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সুশোভনের মতো করেই তাকে কামনা করেছে। সেও যদি তাই করে তাহলে একটা বিরাট ভান করবার কী দরকার ছিলো তার। লেখাপড়া শেখাবার ছলনায় সুশোভনের কোনও অধিকার নেই গিজলার কাছে নিজেকে প্রধান করে তোলবার। তার লেখাপড়া হবে মুখ্য আর গৌণ হবে তার মন। আর যাকে যতো আঘাত দিক, যতো ছোটো করুক, এই পৃথিবীতে গিজলা বোধহয় একমাত্র মানুষ যার কাছে কিছুতেই নিজেকে সে এমন দীন করে তুলতে পারবে না। আজকাল নিজের সংগে সারাদিন কারণে অকারণে সে এমনি বোঝা পড়া করে আর ভাবে তাকে সংযত হতে হবে, কঠিন হতে হবে, সংহত করতে হবে ভাবাবেগ। কিছুতেই নিজের ব্যক্তিত্বকে সে খর্ব করবে না, দিশা হারাবে না। আবার আগের মতো সে শুধু নিজের কাজ করে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ সুশোভনের মনের জোর যেন কমে গেছে। সে যেমন ভাবে, কাজে তেমন করতে পারে না। গিজলা সামনে এসে দাঁড়ালেই তার সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। আর বারবার বৌদিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কলম খুলে এক লাইন লিখতে সঙ্কোচ হয়।

সুশোভনের সংগে আলাপ হয়ে নানা কথাবার্তা হবার পর এ বাড়িতে এতো কম মাইনেতে ঝিয়ের কাজ করতে গিজলার আর ভালো লাগে না। তার অনেক উপার্জন করে সুখে দিন কাটাতে

ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করবে সে? এ পোড়া পৃথিবীতে তার মতো মেয়ের বোধহয় কিছুই করবার নেই। কিন্তু এমন করে সে আর চালাতে পারছে না। তার সব সাধ এখনও অপূর্ণ থেকে গেল।

এ বাড়ির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে প্রায়ই মাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে গিজলা। লেখে, এখানে ঝিয়ের কাজ করতে আমার আর ভালো লাগছে না। এদের ব্যবহার ভালো নয়। কম মাইনে দেয়, কিন্তু ভীষণ খাটিয়ে নেয়।. তুমি জানো পরিশ্রম করতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু এ যে পশুশ্রম। যা পাই তা থেকে এক পয়সাও জমাতে পারি না। সব খরচ হয়ে যায়। কবে আবার দেশে ফিরবো জানিনা। তোমাকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু তা হবার উপায় নেই বলে বড়ো কষ্ট হয়। তুমি আমাকে ঘন ঘন চিঠি লিখো। আমি ভারতবর্ষের এক পণ্ডিতের কাছে অবসর সময়ে লেখাপড়া শিখছি। ভদ্রলোক খুব ভালো। আমাকে খুব যত্ন করে লেখাপড়া শেখায়। কোনো খরচ নেয় না। তুমি বোধহয় ভারতবর্ষের কোনো লোকের সংগে কখনও কথা বলো নি। আমি দেশে থাকতে রাস্তায় দু একজনকে দেখেছিলাম বটে কিন্তু ওরা যে এতো বুদ্ধিমান হয় সেকথা জানতাম না। তুমি কেমন আছো জানিও। আমার শরীর এখানে খুব ভালো আছে। চিঠি পেয়েই উত্তর দিও।

বাবার কথা ইচ্ছে করে সে কিছু লিখলো না। একবার মনে হলো দুকথা লেখে কিন্তু মার কথা ভেবে শেষ অবধি আর লিখতে পারলো না। বাবার সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখানো তার মা একেবারেই পছন্দ করে না। তাকে নিয়ে বাবার সংগে প্রায়ই মার তর্কাতর্কি হয়।

এখন অবশ্য বাবা একেবারে নীরব হয়ে গেছে। গিজলার মার বয়স মোটে চল্লিশ। গিজলার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী সে।

আর তার বাবার বয়স ষাটের কাছে। গিজলা অতো শত বোঝে না তবে বয়স বাড়বার সংগে সংগে এইটুকু বুঝতে পারলো তার মার সংগে বাবার মোটেও ভাব নেই। মা বাবাকে প্রায়ই ভয় দেখায়, তোমার সংগে আমি বেশিদিন থাকবো না। শিগগিরই অন্য কোথাও চলে যাবো।

বাবা গম্ভীর হয়ে বলে, কারোর সংগে তুমি বেশিদিন থাকতে পারবে না। তবে খেয়াল রেখো, বয়স হলো। আর রূপ যৌবন দুদিনের।

কথা শুনে মা চিৎকার করে ওঠে, তবু তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোটো। এখনও পৃথিবীকে দেখবার অনেক সময় আছে আমার। তুমি তো আজ বাদে কাল মরবে—

গিজলার বাবা রাগে না। শান্তস্বরে বলে, জানো যখন যে আমি শিগগির মরবো তখন দুদিন ধৈর্য ধরে বাসনা চেপে রাখো, মরে গেলে যা খুশি করো। পাড়ার লোকে নানা কথা বলতে আরম্ভ করেছে আজকাল তোমার সম্পর্কে—

কী! সব ভুলে তীক্ষ্মস্বরে মা বলে ওঠে, কী ধার ধারি আমি পাড়ার লোকের? কী করে তারা আমার জন্যে? তারা কি জানে যে আমি যার সংগে দশ বছর ঘর করলাম সে আসলে পুরুষ নয়?

আরও গম্ভীর হয়ে বাধা দিয়ে গিজলার বাবা উত্তর দেয়, মেয়ে আছে সেকথা ভুলে ;যেওনা, পাড়ার লোক ওকেও দেখে তো, কাজেই আমার সম্বন্ধে হাজার চেঁচালেও ওরা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

থাকো তুমি তোমার পাড়ার লোক নিয়ে। আমার যখন যা খুশি আমি তাই করবো—

মার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বাবা বলে, আমার হাতে তুমি একদিন গুলি খেয়ে মরবে।

মা একটুও ভয় পায় না। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, আমিও বন্দুক ছুঁড়তে জানি। দেখা যাবে কে কার গুলিতে মরে।

মার সংগে বাবার এমনি তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি চলতো প্রায়ই। জন্মের পর থেকেই এমনি এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে গিজলা মানুষ হয়েছে। খুব ছেলেবেলার কথা আজ অবশ্য তার ভালো মনে পড়ে না, কিন্তু সেসব কথা ভাবলে আজও কেমন একটা অদ্ভুত আশঙ্কায় তার গা ছমছম করে। কেননা অকারণে তাকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। বাবার ওপর রেগে মা তাকে মারধোর করেছে আর সে মার অনুগত এবং ভবিষ্যতে মার স্বভাব পাবে ভেবে বাবাও তাকে খুব বেশি আমল দেয় নি।

ছেলেবেলা থেকে এমনি পরিবেশে মানুষ হয়েছে বলে সুখের সংসার সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি। সে আজও ভাবে বিয়ে করে কেউ সুখী হয় না—সংসার করতে গেলে তার মা বাবার মতো জ্বলে পুড়ে দিন কাটাতে হয়।

একটু বড়ো হবার সংগে সংগে মা তার সংগে স্পষ্ট আলোচনা করতে আরম্ভ করলো, কখনও কম বয়সে বিয়ে করবি না, বুঝলি গিজলা ?

গিজলা হেসে বলতো, আমি বিয়েই করবো না মা।

খুব ভালো কথা। আমিও চাই না তুই বিয়ে করিস। অনেক লোকের সংগে মেশ, জীবনকে ভালো ভাবে উপভোগ কর। একটা বুড়োকে বিয়ে করে নিজের কবর নিজে খুঁড়িস না।

বাবার কী দোষ সে কথা কিন্তু গিজলা বুঝতে পারতো না— আজও পারে না। বরং সেই বয়সে তার মাঝে মাঝে মাকে দোষ

দিতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস ছিলো না তার। মাকে সে যেমন ভালোবাসতো তেমন ভয় করতো।

কিন্তু তবু বাড়ির ওপর খুব বেশি আকর্ষণ তার ছেলেবেলা থেকেই ছিলো না। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করতো না বেশিক্ষণ।

সে বন্ধু বান্ধবের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় বসে থাকতো কিংবা পথে পথে ঘুরে বেড়াতো। এমনি করেই সে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগলো।

সে দিনটির কথা আজও গিজলা ভুলতে পারে নি। যখন যেখানে থাক প্রায়ই মাঝে মাঝে তার সেকথা মনে পড়ে। যেদিন সে মার সংগে প্রথম ব্যালে দেখতে গিয়েছিলো। মার আর এক বন্ধুও সংগে গিয়েছিলো। তার কথা আজ গিজলার একেবারেই মনে পড়ে না। মার বন্ধু বান্ধবের কথা তার মনে থাকবার কথাও নয়। কিন্তু এটুকু মনে আছে যে মা কখনও বন্ধু বাদ দিয়ে দিন কাটাতো না। কেউ না কেউ প্রত্যেক শনি-রবিবারে তার সংগে দেখা করতে আসতো। তারা মাকে নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতো। কোনো কোনোদিন ইচ্ছে হলে মা তাকেও সংগে নিয়ে যেতো।

ফিরে আসবার পর বাবার সংগে আরম্ভ হতো মার তুমুল তর্ক। সব কথা বুঝতে পারতো না গিজলা। কিন্তু ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠতো। একবার সে বাবার হাত চেপে ধরতো, একবার সে মার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

যেদিন মা গিজলাকে সংগে নিয়ে যেতো না সেদিন সে তাড়াতাড়ি বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করতো। আর আপন মনে অনেক আবোলতাবোল বকতো বাবার সংগে।

কেননা ওইটুকু বয়সেও বাবার চেহারা দেখে সে তার মনের

ভাব সহজে বুঝতে পারতো। কখনও রাগের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠছে বাবার মুখে, কখনও বা রাস্তায় পায়ের শব্দ শুনলেই দরজার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তারপর মা ফিরে এলেই তর্কা-তর্কি, ঠেলাঠেলি—সারারাত ভয়ে গিজলার ঘুম হতো না।

গিজলার তখন বয়স কতো আজ সেকথা ঠিক মনে নেই। সাত কিংবা আট হবে। মার সংগে লুক্সেমবুর্গে সে ব্যালে দেখতে গিয়েছিলো। এমন দৃশ্য তার আগে আর কখনও দেখে নি গিজলা। বাজনার তালে তালে ছেলে মেয়েদের কী অপূর্ব অঙ্গ ভঙ্গি। গিজলা সব ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলো। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা বুজলো না। বাড়ি ফিরে পরদিন থেকে সে ওদের মতো করে নাচবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর কিছুতে মন বসলো না গিজলার। কেবলই মাকে সে বলতে লাগলো, মা আমি নাচ শিখবো—আমি অমনি করে নাচবো। ওইটুকু বয়সে মেয়ের নাচে অতো উৎসাহ দেখে মা একদিন তাকে সংগে নিয়ে ব্যালের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলো।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে-ইস্কুলে গিজলা আশ্চর্য নাম করে ফেললো। শিক্ষকরা মাকে জানালো যে তার মেয়ে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী বলে ভবিষ্যতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। নাচের জন্যেই যেন গিজলার শরীর তৈরী হয়েছে। যেমন রূপ তেমন গুণ তার। তারা আরও অনুরোধ জানালো, কোনোদিন কোনো কারণেই যেন গিজলার নাচ বন্ধ না করা হয়।

নাচ বন্ধ করবে কেন গিজলা, নাচের জন্যে বোধহয় সে সব কিছু ছাড়তে পারে। বাড়িতে থাকতে তার ভালো লাগে না, লেখাপড়ায় তার একেবারেই মন নেই, নাচ ছাড়া তার আর কোনো আকর্ষণ নেই—আর কিছু করবার নেই। ব্যালের সব

কৌশল সে যেমন করে হোক আয়ত্ত করে নেবে, তা যতো শক্ত হোক না কেন। কখনও তার ক্লান্তি আসে না, মনে হয় না যে সে পরিশ্রম করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন অক্লান্ত উৎসাহে সে ব্যালের কঠিন কলা কৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা করে।

বাড়িতে যখন সে নাচ অভ্যাস করে তখন মা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর বলে, বড়ো হলে তুই খুব ভালো নাচতে পারবি গিজলা, তোর অনেক টাকা হবে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলে, তখন আমরা খুব ভালোভাবে থাকবো।

গিজলা উত্তর দেয়, আমি যদি একপয়সা রোজগার করতে না পারি তাহলেও নাচ ছাড়তে পারবো না মা।

মেয়ের কথা শুনে মা একটু অপ্রসন্ন মুখে বলে, রোজগার করতে পারবি না কেন? যে মেয়েরা ব্যালে করে বেড়ায়, দেখিস না তারা কতো বড়োলোক?

গিজলা হেসে বলে, জানি।

বয়স বাড়বার সংগে সংগে গিজলার মনে বাবার ওপর অভিমান জমে উঠলো। এই নাচের ব্যাপার নিয়ে কোনো উৎসাহ দেখায় না বাবা। গিজলার সব ব্যাপারেই সে যেন বড়ো বেশি নির্বিকার। তাই তার মনের কাছে মা আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে লাগলো আর বাবাকে মনে হতে লাগলো দূরের মানুষ। কিন্তু এ ভাবনা কতোক্ষণেরই বা! এসব নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার সময় কোথায় গিজলার!

কয়েক বছরের মধ্যে গিজলা একটা প্রথম শ্রেণীর ব্যালের দলে চাকরি পেলো। দেশে দেশে ঘুরে ব্যালে দেখানো এদের প্রধান কাজ। মাইনে প্রথমে অবশ্য খুব বেশি নয়, তবে কর্তৃপক্ষ কথা

দিলো যে কাজ দেখাতে পারলে যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক অনেক বাড়িয়ে দেয়া হবে।

এইবার কিন্তু হঠাৎ বাবা বাধা দিলো। মার আর এক বন্ধুর সাহায্যে সে এ কাজ জোগাড় করেছিলো। বাবা তার কোনো কথায় থাকে না বলে তাকে সে প্রথমে এ খবর জানানো প্রয়োজন মনে করে নি।

যেদিন সন্ধ্যে থেকে তাকে চাকরি করতে হবে সেদিন সকালে বাবা বেরোবার আগে গিজলা তাকে বললো, বাবা আজ থেকে আমি স্টেজে নাচবো। একটা ভালো চাকরি পেয়েছি।

কেমন করে পেলে ?

আঙ্কল রাইনহার্ট জোগাড় করে দিয়েছে।

কে ?

গিজলা আর একবার তার মার বন্ধুর নাম বললো। তার নাম শুনে বিরক্তির ছায়া নামলো বাবার মুখে। গিজলার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে সে বললো, এতো কম বয়সে কেউ থিয়েটারে চাকরি নেয় ? আমাকে আগে বলো নি কেন ?

গিজলা বললো, এই মানে বলবো আর কী—

তাকে থেমে থেমে কথা বলতে দেখে কঠিন স্বরে বাবা বললো, ঠিক তোমার মার মতো স্বভাব হচ্ছে, এইটুকু বয়স থেকে যতো আজে বাজে লোকের সংগে মিশতে আরম্ভ করবে—

তার বাবার গলা শুনতে পেয়ে পাশের ঘর থেকে ঝড়ের মতো মা এসে তীক্ষ্ণস্বরে বাবাকে বললো, যখন তখন মেয়েকে আমার নামে যা-তা বলবে না, তোমাকে বলবার প্রয়োজন মনে করি নি। মেয়ের কোন ব্যাপারে তুমি থাকো ? আমি ওর স্টেজে চাকরি পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি—

মার গলার স্বরের সংগে তাল মিলিয়ে বাবাও বললো, স্টেজে কোন ধরনের মেয়েরা চাকরি করতে যায় জানো না? তুমি যে মেয়েকে তোমার চেয়েও এক ধাপ নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছো সে খেয়াল আছে?

বেশ করবো। মেয়ের ভাবনা এতোদিন যখন তুমি ভাবোনি তখন কষ্ট করে আর না ভাবলেও চলবে। আমার চেষ্টায় ও যে একটু নাম করে পয়সা রোজগার করবে তা আর সহ্য করতে পারছো না, না?

পয়সা রোজগারের অনেক উপায় আছে। ওসব আজেবাজে থিয়েটারে চাকরি করলে ভবিষ্যতে মেয়ের কী অবস্থা হবে জানো?

কিছু হবে না। ভালো খেয়ে পরে সুখে থাকবে। তুমি কী অবস্থায় আমাদের রেখেছো বুঝতে পারো না? যেমন করে হোক রোজগারের চেষ্টা না করলে চলবে কেন?

মেয়ের বয়স কম। আর মেয়ে তোমার একার নয়। ইচ্ছে করলে আমি মামলা করে ওসব ব্যালে বন্ধ করে দিতে পারি—

তোমার যা খুশি তাই করো। বারবার বলেছি চেঁচামেচি করে আমাকে শুধু শাসাতে এসো না—

তোমার যা খুশি তুমিও তাই করতে পারো। কিন্তু গিজলাকে নষ্ট করবে কেন?

কারণ ও আমারই মেয়ে।

চিৎকার করে বাবা বললো, আমারও মেয়ে গিজলা—

বাবার কথা শুনে পাগলের মতো জোরে হেসে মা বললো, কে বললো ও তোমার মেয়ে? নিজের কথা কিছু জানো না? অমন মেয়ে কেমন করে তোমার হবে?

হঠাৎ যেন মন্ত্রের মতো কাজ হলো। একথা শোনবার পর সব তর্জন গর্জন থেমে গেল বাবার। আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল। এমন ব্যাপার আরও দু একবার গিজলার সামনে হয়েছে। তাকে নিয়ে বাবা মার সংগে যেমনি বেশি চেঁচামেচি করেছে অমনি মা ওই ধরনের কথা বলে বসেছে। ব্যস বাবার মুখ সংগে সংগে একেবারে বন্ধ।

মার মেজাজ যখন ভালো থাকে তখন আরও নানা গল্প করতে করতে হঠাৎ গিজলা জিজ্ঞেস করলো একদিন, আচ্ছা মা, তুমি বাবাকে ওকথা কি এমনি বল, না সত্যি সত্যি ?

কী কথা রে ?

যে আমার বাবা নয় ?

মা কোনও উত্তর দিলো না। চুপচাপ ঘর পরিষ্কার করতে লাগলো। তারপর কী ভেবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো, বড়োদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী তোর ? এসব কথা আর কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করবি না—

মার কথা শুনে সেই বয়সেও গিজলা মনে মনে হাসতো। তার সামনে এসব কথা তুলে মা বাবা যখন প্রচণ্ড কলহ করে তখন তাদের গিজলার কথা খেয়াল থাকে না। আর সে কিছু জিজ্ঞেস করলেই যতো দোষ।

যাহোক, একথা শোনবার পর নিজেকে রহস্যময়ী বলে গিজলার মনে হতো। বাবার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতো সত্যি কি এ লোক তার বাবা নয়। বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হতো না তার, কিন্তু নিজের জন্ম রহস্য জানবার আগ্রহে তার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যেতো। ভাবতো, যেমন করে হোক, এ রহস্যের সমাধান করতে হবে একদিন।

বাবা তার স্টেজে চাকরি করা নিয়ে গোলমাল করলেও গিজলা জানতো শেষ অবধি তার দ্বারা কিছু করা সম্ভব হবে না, মা সব ব্যবস্থা পাকা করে দেবে। অনেক সময় নানা ব্যাপার নিয়ে বাবা লাফালাফি করে ভয় দেখায় বটে কিন্তু পরে আর কিছু করে না। তাই ব্যাংকেতে চাকরিকরায় তার আপত্তি থাকলেও গিজলা মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলো পরে বাবা কোনো গোলমাল করবে না। আর বাধা দিলেও গিজলাকে এ ব্যাপারে ঠেকিয়ে রাখা তার পক্ষে কিছু-তেই সম্ভব ছিলো না। প্রয়োজন হলে নাচের জন্যে সব ভুলে, সব কিছু তুচ্ছ করে সে বাবাকে একেবারে অস্বীকার করবে। এখন ব্যালের চেয়ে বড়ো তার কাছে আর কেউ নয়—কিছু নয়।

ওদিকে মাকে নিজের খরচ দেবার জন্যে গিজলা বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। এখন সে বড়ো হয়েছে, তার জন্যে সংসারের খরচ বাড়ছে। কিছু টাকা মার হাতে তুলে দিতে না পারলে তার পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হবে।

বাবার ব্যবসা বর্তমানে খুব ভালো যাচ্ছে না। তার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান। কিছুদিন থেকে তাদের দেশে সব কিছুতেই কঠিন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা হচ্ছে। বাবার বয়স বেশি। ব্যবসায়ে উৎসাহ কমে গেছে এখন। তাই তার পক্ষে আধুনিক কর্মীদের সংগে প্রতিযোগিতা করা আর সম্ভব নয়। কাজেই দিনে দিনে তাকে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। নতুন করে আবার এগিয়ে আসবার সম্ভাবনাও নেই। গিজলাও এখন একথা বুঝতে পারে যে মার সংগে বাবার দ্বন্দ্বের মূল কারণ হলো অর্থাভাব। বাবার বয়স মার চেয়ে অনেক বেশি হলেও প্রচুর অর্থ থাকলে হয়তো সংসারের এতো অশান্তি হতো না। গিজলা জানে তার মার নজর বেশ উঁচু। তার বাবাকে সে

এঞ্জিনীয়ার জেনেই একদিন বয়সের কথা ভুলে বিয়ে করতে দ্বিধা করে নি। কেননা তার ধারণা ছিলো, এঞ্জিনীয়াররা খুব সহজে অর্থ উপার্জন করতে পারে। কিন্তু অতো রূপ নিয়ে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো একজন মানুষকে বিয়ে করে কোনো সাধ পূর্ণ হলো না তার মার। রূপের অপচয় হলো শুধু। এখনও তার মার আশ্চর্য রূপ আছে। তাই সে আশা ছাড়ে নি। বোধ হয় ভুল সংশোধন করবার জন্যে আবার নতুন করে রূপ যৌবন বিলিয়ে দিতে চায়। আজকাল গিজলা সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে।

কিন্তু ব্যালের দলে যোগ দেবার পর গিজলার আর কোনো দিকে মন দেবার সময় রইলো না। তার সমস্ত মন প্রাণ যেন এক নতুন নেশায় মেতে উঠলো। নতুন পরিবেশ—নতুন মানুষ চারপাশে—গিজলার জীবনও যেন অকস্মাৎ নতুন হয়ে উঠলো। আর কোনো অভাব বোধ নেই তার।

এক গায়ক ছিলো তাদের দলে। বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে তার বয়স। নাম কার্ল। অমন গান গিজলা আর কখনও কোথাও শোনে নি। সেই গানের তালে তালে তার হাত পা দুলে উঠতো। আর সেই বয়সে ইচ্ছে হতো কার্লের গান শুনতে শুনতে তার পাশে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ মা বাবার কথা মনে পড়ে যেতো গিজলার। আর ভয়ে তার শরীর শিউরে উঠতো। গায়কের অপূর্ব কণ্ঠস্বরের চেয়ে তার বয়সের কথা প্রধান হয়ে উঠতো গিজলার কাছে। না না, কিছুতেই জীবনের একেবারে প্রথম থেকে কার্লের মতো প্রবীণ লোকের সংগে ঘনিষ্ঠতা করা চলবে না তার। মার ভয়াবহ পরিণামের কথা মনে করে সে কার্লের কাছ থেকে নিজেকে যথাসাধ্য দূরে সরিয়ে

রাখতে চায়। কিন্তু আবার হঠাৎ কার্লের গান তার সব সতর্কতার প্রাচীর নিমেষে চুরমার করে দেয়।

একদিন কার্ল গিজলার সাজবার ঘরে এসে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, কি গো ছোট মেয়ে, কই আজকাল আর আমার কাছে এসে আগের মতো গান শুনতে চাও না তো?

গিজলা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। মনে মনে ভাবলো, তোমার চোখের দৃষ্টি দেখলে আজকাল আমার ভয় করে। তাই মার কথা মনে করে পালিয়ে বেড়াই।

কার্ল আবার বললো, চলো ছুটির দিনে দুজনে কোথাও বেড়াতে যাই? নির্জনে বসে অনেক গান শোনাবো তোমায় আমি।

মৃদুস্বরে গিজলা বললো, মাকে জিজ্ঞেস করে বলবো।

কার্ল হেসে গিজলাকে আরও কাছে টেনে বললো, লক্ষ্মী মেয়ে দেখছি তুমি। মাকে জিজ্ঞেস না করে কিছুই কর না বুঝি?

গিজলা বললো, অনেকক্ষণের জন্যে কোথাও গেলে মাকে বলে যাই—

বেশ বেশ, কার্ল হেসে বললো, আমার সংগে বেরোলে মা কিছু বলবে না। তোমার মা আমার গান শুনতে ভালোবাসে নিশ্চয়ই। জানো না আমার এক একখানি গানের দাম কতো? মাকে বলবে সেই আমি বিনা পয়সায় তোমাকে সারাদিন গান শোনাতে চেয়েছি।

গিজলা বুঝতে পারলো কার্লের কথায় যেন প্রচ্ছন্ন গর্বের সুর ফুটে উঠলো। সে ভয়ে ভয়ে বললো, আচ্ছা বলবো।

তবু এতো সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও গিজলার জীবনে সেই প্রবীণ গায়ক কার্ল হলো প্রথম মানুষ। সমস্ত ভুলে সে তাকে নিয়ে

মেতে উঠলো। মাকে তার কথা সে জানালো বটে কিন্তু আসল ব্যাপার ভাঙলো না। তাকে খুব স্নেহ করে—এমনি নানা কথা বলে শুধু কার্লের নাম উল্লেখ করলো মাত্র।

গানে গিজলার মার খুব বেশি উৎসাহ নেই। মেয়ের মুখ থেকে কার্লের ঘন ঘন প্রশংসা শুনে সে মুচকি হেসে শুধু বললো, যেই হোক সে—যতো নাম ডাক থাক, মন দেয়া নেয়া ব্যাপারে খুব সাবধান থাকিস। সব সময় মনে রাখিস, জীবনে অনেক দেখে তবে ঘর বাঁধতে হয়।

ওদিকে আর একজন চোখে নিবেদনের ভাষা নিয়ে গিজলার দিকে তাকিয়ে থাকতো। রূপবান তরুণ যুবক। তার নাম টমাস। কিন্তু গিজলাকে কিছু বলতে সাহস করতো না সে। কারণ কার্লের সম্মান সেখানে অনেক বেশি। আর টমাস জানতো যে কার্ল গিজলাকে কী চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে।

তবু গিজলা টমাসের মনের ভাব বুঝতে পারতো। তার কথায়-বার্তায় ব্যবহারে টুকরো হাসির বিনিময়ে গিজলার কাছে কিছুই গোপন থাকতো না। সে জানতো টমাস তাকে কী কথা জানাতে চায়।

অথচ এই ব্যালের দলের অন্যান্য মেয়েদের সংগে নাকি আগে ওদের বন্ধুত্ব ছিলো। এর মধ্যেই গিজলা লক্ষ্য করেছে, এখানে কেউ একা সময় কাটায় না। প্রত্যেকের একটি করে বিশেষ বন্ধু আছে। এদের মধ্যে অনেকে হঠাৎ নিদারুণ ঈর্ষায় গিজলার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

বিশেষ করে একটি মেয়ে, তার নাম ফ্রেডারিকা, গিজলাকে সময়ে অসময়ে অপদস্থ করবার জন্যে সে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আসলে গিজলা আসবার পর এখানে তার অনেক ক্ষতি হয়ে

গেছে। আর সে জানতো গিজলা দিনে দিনে এখানে সকলকে ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে। এখানকার প্রত্যেকে তার মধ্যে সে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছে। সে আসবার আগে ফ্রেডারিকা ছিলো এদের সকলের প্রিয়। এখন গিজলা তাকে ঠেলা মেরে যেন অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া কার্ল যে কোনোদিন এই ব্যালের দলের কোনো মেয়েকে নিয়ে মাতবে সেকথা ফ্রেডারিকা কল্পনা করতে পারেনি। সে নিজে ইতিপূর্বে কার্লের সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার অনেক কৌশল করে ব্যর্থ হয়েছে।

ফ্রেডারিকা ঠিক করলো যেমন করে হোক কার্লের সংগে গিজলার এই সম্পর্কের শেষ করে দিতে হবে। এই দলের প্রধান নর্তকী হয়ে সে যদি কার্লকে না পায় তাহলে আর কাউকেও পেতে দেবে না।

সেদিন নাচের পর ফ্রেডারিকা গিজলাকে বললো, কাল তো নাচ নেই, যেদিন এখানে আসতে হয় না সেদিন তুমি কী করে সন্ধ্যে কাটাও গিজলা ?

গিজলার সংগে বাইরের জগতের পরিচয় খুব সম্প্রতি হতে আরম্ভ হয়েছে। তাই হেঁয়ালি করবার লোভ দমন করতে না পেরে সে বললো, কতো বন্ধু-বান্ধব আছে আমার, তাদের সংগে কতো জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

কৃত্রিম কৌতূহল প্রকাশ করে ফ্রেডারিকা জিজ্ঞেস করলো, অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে নাকি তোমার ? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার বিশেষ বন্ধু মাত্র একজন ?

গিজলা হেসে বললো, বলো তো সে কে ?

সেকথা আর কে না জানে ? কার্ল ?

নাম শুনে প্রথমটায় মনে মনে একটু চমকে উঠেছিলো গিজলা। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো। ফ্রেডারিকার কাছে কিছু না ভেঙে সহজ স্বরে বললো, কী যে বল, ওই বুড়োটার ইচ্ছে আছে বটে আমাকে নিয়ে মাতামাতি করবার। কিন্তু আমি কি এতোই বোকা যে টমাসের মতো সুদর্শন যুবককে ছেড়ে ওই বুড়োর সংগে ঘুরে বেড়াবো?

ফ্রেডারিকা গিজলার কথা শুনে খুশি হয়ে বললো, সেকথা কার্লকে স্পষ্ট জানিয়ে দাও না কেন?

মুখে ক্রীম ঘষতে ঘষতে গিজলা বললো, দুদিন সবুর করো। যথা সময়ে ঠিক জানিয়ে দেবো। এখন কার্লের মতো লোককে চটানো ঠিক হবে না। নতুন ভর্তি হয়েছি তোমাদের দলে। আগে ভালো করে সব হালচাল বুঝে নিই।

ফ্রেডারিকা জিজ্ঞেস করলো, কার্লের সংগে বাইরে যাও না তুমি?

অনেক সাধাসাধি করলে তবে যাই।

অনেক সাধাসাধি করে বুঝি?

নিশ্চয়ই। আমার মতো এমন সুন্দরী কচি মেয়ে ওই বুড়ো পাবে কোথায়? সকলে ওর গান শুনতে ভালোবাসে, কিন্তু কজন ওকে প্রেমিক মনে করতে পারে বলো?

ফ্রেডারিকা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললো, তুমি ঠিক কথাই বলেছো গিজলা, তোমার মতো বয়সের কোনো মেয়ে ওর কাছে আসে না বলেই তোমাকে নিয়ে ও অতো বাড়াবাড়ি করে। কার্ল যতো বড়ো গায়ক হোক, ওর স্বভাব মোটেই ভালো নয়।

আমারও তাই মনে হয়।

কার্লকে সত্যি মন্দ লোক ভেবে ফ্রেডারিকার সংগে এসব

আলোচনা গিজলা করেনি। আসলে সে এখন কারোর কাছে তার দুর্বলতা সহজে প্রকাশ করতে চায় না—মার কাছেও নয়। সত্যি ব্যাপার গোপন করবার জন্যে রসিকতার ছলে ফ্রেডারিকার সংগে সে নানা কথা বলেছিলো। তখন ভাবতে পারেনি ফ্রেডা-রিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কার্লের কাছে তাকে এতো ছোটো করে তুলবে। একেবারে শুরুতেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো গিজলা।

অবশ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে কার্লের বয়সের কথা ভুলে তাকে মেনে নিলেও তার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব গিজলার মনে প্রবল ছিলো। নির্জনে বসে গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে কার্লের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে গিজলার সামান্য সঙ্কোচ হতো না, কিন্তু পরে টমাসের সংগে নাচতে নাচতে প্রচুর উন্মত্ত করতালির মধ্যে টমাসকে একান্তে নিবিড় করে পেতে ইচ্ছে করতো। আর কেবলই মনে হতো, কার্ল যে তার চেয়ে অনেক বড়ো, তাকে নিয়ে সে সারা জীবন কাটাবে কেমন করে। হয় তো এসব কথা তার মনে হতো বলেই সেদিন ফ্রেডারিকার সংগে অমন আলোচনা করতে দ্বিধা করে নি। তা না হলে কার্লের সামান্য অসম্মান সে সহ্য করতে পারতো না।

যাহোক, ফ্রেডারিকা যে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়েছে সেকথা দু চারদিন পরে গিজলা বুঝতে পারলো। কার্লের কথা শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। অকারণে ফ্রেডারিকা যে তার সংগে এমন শত্রুতা করবে তা সে ভাবতে পারে নি।

আগের দিন কার্লের সংগে সারাদিন কাটিয়েছে গিজলা। তার হোটেলে বসে অনেক গল্প করেছে, অনেক গান শুনেছে। নিভৃতে কার্লের কাছে বসে থাকলে গিজলা সব ভুলে যায়। কার্লও কাল মন খুলে কথা বলেছিলো তার সংগে।

কার্ল বলেছিলো, আমি অনেক ব্যালের দলে কাজ করেছি গিজলা, অনেক মেয়েকে দেখেছি। কিন্তু তারা কেউ তোমার মতো এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো ভালো নাচ শিখতে পারে নি।

কার্লের মুখ থেকে নিজের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে খুশিতে মন ভরে উঠেছিলো গিজলার। তার বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে সে মৃদু স্বরে বলেছিলো, আমার সৌভাগ্য যে তোমার মতো লোকের কাছ থেকে আমি এমন প্রশংসা পেলাম।

তাকে আদর করে কার্ল বলেছিলো, দেশসুদ্ধ লোক তোমার প্রশংসা করবে, তার আর দেরি নেই—

বাধা দিয়ে গিজলা বলেছিলো, নিন্দা প্রশংসার কথা জানি না, সারাদিন সব ভুলে আমি শুধু নাচতে চাই। কিছু পাই বা না পাই, ক্ষতি নেই।

সত্যিকার শিল্পীর মতো কথা তুমি বললে গিজলা। কতোটা পাবো আর কতোটা হারাবো—এসব লাভ লোকসানের হিসেব জাতশিল্পী কখনও করে না। তোমাকে প্রথম দিন দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি খাঁটি শিল্পী। তাই তোমার সংগ পেতে ভালোবাসি আমি। তোমার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই।

ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, চোখে ঘোর নিয়ে গিজলা বলেছিলো, কিন্তু নাচ বাদ দিয়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে সব ভুলে আমি শুধু নাচতে চাই।

শক্ত করে গিজলার হাত ধরে কার্ল হেসে বলেছিলো, তা হলে তোমাকে সব ছাড়তে হবে, আর কোনো দিকে তুমি কখনও মন দিতে পারবে না।

চাই না মন দিতে। আর কিছুই আমি চাই না কার্ল।

গিজলাকে কাছে টেনে হাল্কা সুরে কার্ল বললো, তা হলে

আমার কী হবে ? আমি তো আশা করে আছি তুমি আমার দিকেও একটু মন দেবে ? বলো গিজলা ?

দিয়েছি তো। সে কথা বুঝতে পারো না কেন ?

তাহলে আমি যখন এখান থেকে চলে যাবো, তুমিও যাবে আমার সংগে ?

কোথায় যাবে তুমি ?

কার্ল বললো, কোনো বিশেষ দলে আমি বেশিদিন কাজ করি না। তাতে আমার ক্ষতি হয়। সব দলের সংগে আমার সময়ের চুক্তি থাকে। সময় ফুরোলেই আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই। আর মাস তিনেকের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবো।

আমিও যাবো তোমার সংগে। তুমি যেখানে যাবে সেখানে আমারও একটা ব্যবস্থা করে দিও।

নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু দেশ ছেড়ে, তোমার মা বাবাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না ?

না, তোমার সংগে থাকলে আমার কোনো অভাব বোধ থাকবে না। আর বাড়ির ওপর আমার তেমন টান নেই।

তাই হবে গিজলা। আমি খুশি হয়ে তোমাকে সংগে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরবো। আমারও এ সংসারে কেউ নেই। কোনোদিন ছিলো কিনা সেকথা আজ ভালো মনে পড়ে না। আমরা দুজনে মিলে প্রাণ ভরে সংগীত আর নৃত্যের সাধনা করবো।

কার্লের কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিজলা বলেছিলো, আমার সৌভাগ্য প্রথম চাকরি পাওয়ার সংগে সংগে তোমার মতো লোকের সংগে আলাপ হলো !

কার্ল বলেছিলো, আমারও সৌভাগ্য তোমার মতো দুর্লভ ফুলের সৌরভ এতোদিন পর গ্রহণ করতে পারলাম।

সেই সন্ধ্যায় শহরের সব চেয়ে বড়ো হোটেলে কার্লের সংগে গিজলা খেতে গিয়েছিলো। এতো বড়ো হোটেলে সে আর কখনও আসে নি। চারপাশে তাকিয়ে খুশির প্রবল তরঙ্গে তার বুক ভরে যাচ্ছিলো। এক কোণায় একটা ছোটো টেবিল সামনে নিয়ে বসেছিলো ওরা দুজন। টুং টাং করে বাজনা বাজছিলো। হোটেলের চাকর ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলো। লুনেমবুর্গে যে এমন চমৎকার হোটেল আছে সেকথা গিজলা জানতো না।

খেতে খেতে কার্ল বলেছিলো, কোনোরকম সাধনা নিয়ে থাকলে সংসার করা চলে না গিজলা। যদি বড়ো হতে চাও তাহলে নাচের সাধনায় তোমাকে মনপ্রাণ সঁপে দিতে হবে।

সেকথা আমিই তো তোমায় দুপুরে বলেছিলাম, রসিকতা করে গিজলা বলেছিলো, কিন্তু সব শুনে তুমি যে আবার তোমার ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিলে—

ইচ্ছে করেই দিলাম, কার্লও হেসেছিলো, কারণ তাহলে আমাদের সাধনা আরও বেশি সফল হবে। আমরা দুজনে দুজনকে দিনরাত সাহায্য করতে পারবো।

গিজলা উত্তর দিলো না। খেতে খেতে মাঝে মাঝে কার্লের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। রাত বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এতো বেশি আলো আর আড়ম্বর এখানে যে রাতের কথা মনে রাখা কঠিন।

কাল কার্লের সংগে অনেক রাত্তিরে গিজলা বাড়ি ফিরেছিলো। তার মনে তখন সামান্য শঙ্কা কিংবা দৈন্য ছিলো না। অনুভূতির সূক্ষ্ম স্পর্শে তার হৃদয় ভরেছিলো।

বিদায় নেবার আগে কার্ল বলেছিলো, সোমবার সকালে

আজকের মতো আবার আমার হোটেলে চলে এসো গিজলা। আমরা অনেকক্ষণ একসংগে কাটাবো।

নিশ্চয়ই যাবো।

কিন্তু রবিবার কার্লের সংগে দু একটি কথা বলে তাকে অপরিচিতের মতো মনে হলো গিজলার। তখন ব্যালে চলছে, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অবসর সে পেলো না। ভাবলো নাচের পর তার শরীর খারাপ কিনা ভালো করে জেনে নিতে হবে। কেননা আগামী কাল সোমবার—আবার তাদের একসংগে অনেকক্ষণ কাটাবার দিন।

নাচ শেষ হয়ে গেলে পোশাক না বদলে কার্লের ঘরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, তোমার চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন? তোমার কি অসুখ করেছে কার্ল?

গম্ভীর স্বরে কার্ল বললো, আমি ভালোই আছি।

অস্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করে গিজলা বললো, তাহলে তোমার চেহারা এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

সব সময় মানুষের মনের অবস্থা একরকম থাকে না। নানা কারণে আমার মন ভালো নেই।

কী হয়েছে তোমার কার্ল?

সব কথা সকলকে বলা যায় না।

অবাক হয়ে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার সংগে ও রকম করে কথা বলছো কেন?

সেকথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভান করে কার্ল বললো, আগামী কাল তোমাকে আমার হোটেলে আসতে বলেছিলাম, একটু থেমে কঠিন দৃষ্টিতে গিজলার দিকে তাকিয়ে সে আবার

বললো, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার সংগে আমি আর দেখা করতে পারবো না—

কিন্তু কেন? কী দোষ করেছি আমি? কার্লের কাছ থেকে এমন নীরস ব্যবহার পেয়ে গিজলার বুক ঠেলে কান্না আসছিলো।

শুকনো স্বরে কার্ল বললো, আমার বয়স হয়েছে। তুমি তোমার মনের মতো অল্প বয়সী লোক খুঁজে নিয়ে তাদের সংগে আনন্দে সময় কাটাও। আমাকে শুধু শুধু ছলনা করে এই বয়স থেকে নিজেকে ছোটো কিংবা সুলভ করে তুলো না।

এসব কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছো কার্ল?

সেকথা তুমিও জানো, আমিও জানি—

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কয়েক দিন আগে তুমি যে আমার কাছে একেবারে অন্য মানুষ ছিলে।

আমি ভুল করেছিলাম। তোমার চেহারায় পবিত্র ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি ভাবতে পারি নি একজন সুলভ মেয়ের মতো তুমিও আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে, সকলের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াবে।

তুমি কী বলছো? আমি কারোর সংগে তোমার সম্পর্কে কোন আলোচনা করি নি—আমার মার সংগেও নয়।

হঠাৎ কার্লের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, ফ্রেডারিকা আমার কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলে না গিজলা। আমি বুঝতে পেরেছি সে সব সময় আমার মঙ্গল চায়।

ফ্রেডারিকা! গিজলার গলার স্বর অদ্ভুত শোনালো।

এতোক্ষণ পর সে বুঝতে পারলো কে গোলমাল বাধিয়েছে। কিন্তু কেন কার্লের কাছে গিজলার সম্বন্ধে সে মিথ্যা কথা বললো। এখন তাকে সে কেমন করে বোঝাবে, সব মিথ্যা। আমি তোমার

নিন্দে করি নি। হয়তো তোমাকে আয়ত্ত করবার জন্যে ফ্রেডারিকা আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে যা তা বলেছে। তুমি তার কথা বিশ্বাস করো না। কিন্তু গিজলা একটি কথাও বলতে পারলো না। তার সমস্ত শরীর অব্যক্ত উত্তেজনায় কাঁপছিলো। অভিমানে বুক ভরে যাচ্ছিলো তার। কেন কার্ল ফ্রেডারিকার কথা বিশ্বাস করলো? কেন গিজলাকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করলো না, এসব কথা সত্যি কিনা?

ঠিক আছে। কার্ল যেই হোক, তাকে অন্যের কথার ওপর নির্ভর করে এমন অপমান করবার কোনো অধিকার নেই তার। গিজলা এ অপমান সহ্য করবে না, তাতে তার যতো ক্ষতি হয় হোক। আর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় প্রস্তুত হয়ে ফ্রেডারিকা সেখানে এলো।

গিজলার দিকে না তাকিয়ে সে কার্লকে বললো, চলো, অনেক রাত হয়ে গেল যে।

চলো, বাঁকা চোখে গিজলার দিকে তাকিয়ে কার্ল বললো, আমি তো তোমারই অপেক্ষায় বসে আছি।

কোনো রকমে টলতে টলতে সে ঘর থেকে গিজলা বেরিয়ে এলো। তার সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। এ অপমান কিছুতেই সে সহ্য করবে না। যেমন করে হোক ফ্রেডারিকার ওপর নির্মম প্রতিশোধ নেবে।

অবাক হয়ে গেছে গিজলা। এমন করে বিনা দোষে কেউ যে কারোর ক্ষতি করতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। এই পৃথিবীর সব মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে যেন তার। আর কাউকে কখনও সে বিশ্বাস করবে না।

মার কাছে আর কিছুই সে গোপন করতে পারলো না। চোখে

জল নিয়ে সব ব্যাপার খুলে বললো। তখন অনেক রাত। বাইরে গ্রীষ্মের হাল্কা অন্ধকার কাঁপছে। ফ্রেডারিকার ওপর রাগে আর কার্লের ওপর অভিমানে শরীর মন জ্বলে গেলেও তার মনে হলো হাওয়ায় নিরন্তর যেন একটা বিষণ্ণ সুর বেজে চলেছে।

মেয়ের মুখ থেকে সব কথা মন দিয়ে শুনে তার পিঠে হাত বুলিয়ে মা বললো, ছি ছি, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ এমন কান্নাকাটি করে?

সামান্য ব্যাপার নয় মা, কার্ল আমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলো। বলেছিলো, তার সংগে আমাকে নিয়ে যাবে।

দূর পাগলি, সত্যি ভালোবাসা এতো সহজে শেষ হয় না। আর অতো যার বয়স বেশি তাকে নিয়ে তোর এতো মাতামাতি কেন? বলেছি না, আগে অনেক দেখবি তারপর কোনো একজনকে ভালোবাসবি? যাক গে চুকে গেছে ভালোই হয়েছে। এবার থেকে সাবধানে বুঝে শুনে চলবি। আর নিজের দুর্বলতার কথা পট করে কারোর কাছে ভাঙবি না।

ধরা গলায় গিজলা বললো, ওখানে আমি আর কাজ করতে যেতে পারবো না মা। সবাই আমাকে ঠাট্টা করবে। সে-অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

বোকা মেয়ে, গিজলাকে আদর করে মা বললো, তোর মতো বয়সে এ ব্যাপারটা খুব বড়ো বলে মনে হয়। দুদিন সবুর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে অমন কতো লোক আসবে যাবে, তাদের নিয়ে এতো বিব্রত হলে চলে? চাকরি ছাড়বার কথা ভুলেও ভাবিস না। তবু তোর টাকায় সংসারের অনেক সুবিধা হচ্ছে। তোর বাবার রোজগারের ওপর ভরসা করে থাকলে হয়েছিলো আর কী! তা ছাড়া এখন সবে তোর নাম হতে শুরু হয়েছে, এই সময় চাকরি

ছাড়লে সব যাবে। কখন যুদ্ধ বাধে ঠিক নেই। কী জানি কী হবে এ সময় আজে বাজে ভাবনা ভেবে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না।

মার উপদেশে হয়তো কিছু কাজ হলো। পরাভবের গ্লানি প্রাণপণে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো গিজলা। কেন সে ভীরুর মতো পালাবে? সে তো কোনো অন্যায় করে নি। সে বরং অন্য ভাবে প্রতিশোধ নেবে। ওই ব্যালের দলে ফ্রেডারিকার খ্যাতি ম্লান করে দেবে। তার মতো ছলনা করে নয়, সাধনা দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে। টমাস তার সহায় থাকলে ফ্রেডারিকাকে নামিয়ে দিতে খুব বেশি দেরি হবে না তার। মরুক ফ্রেডারিকা কার্লের সংগে। তার মতো দুর্বল মনের পুরুষকে ঘৃণা করে গিজলা।

পরের প্রদর্শনীতে আশ্চর্য রকম ভালো নাচ সে নাচলো। যতোবার গিজলা স্টেজে আসে, দর্শক ততোবার উল্লসিত হয়ে হাত তালি দেয় আর সে না থাকলে তার নাম ধরে গুঞ্জন করে।

সেই রাত্রেই সে টমাসের সংগে থিয়েটার থেকে বেরোলো। ইচ্ছে করেই ফ্রেডারিকার সামনে দিয়ে এলো গিজলা। সে নিশ্চয়ই কার্লের কানে খবরটা পৌঁছে দেবে। হ্যাঁ, এবার থেকে টমাস হবে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। গিজলা নিজে তার সব সঙ্কোচ ভেঙে দেবে। যেকথা এতোদিন টমাস তাকে বলতে পারে নি, আজ অসঙ্কোচে গিজলা তাকে সেকথা বলবে।

হাল্কা জ্যোৎস্না উঠেছে। গ্রীষ্মকাল হলেও শীতের আমেজ আছে বাতাসে। থেকে থেকে শিহরণ লাগে শরীরে। গাড়িতে টমাসের গা ঘেঁষে গিজলা বসেছিলো।

কই, খুব আস্তে গিজলা বললো, তুমি তো একদিনও আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে না টমাস?

টমাস রসিকতা করে বললো, আমি অনেক কথা তোমাকে বলবার চেষ্টা করতাম কিন্তু মনে হতো আমার কথা শোনবার উৎসাহ খুব বেশি নেই, তাই চুপ করে থাকতাম।

উৎসাহ ছিলো, ইচ্ছে করে তোমাকে একটু বেশি সময় দিয়েছিলাম—

গিজলাকে বাধা দিয়ে খুব জোরে হেসে টমাস বললো, আমাকে সময় দিয়ে নিজে আর দু' একজনকে দেখে নিতে চেয়েছিলে বুঝি?

ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। আমি ভুল করেছি। তোমাকে আগে বুঝতে পারি নি বলে আমি সত্যি দুঃখিত।

ভুল সকলেই করে। আর তোমার মতো বয়সে অভিজ্ঞতা যতো হয় ততো বুদ্ধি বাড়ে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার বুদ্ধি অনেক বেড়ে গেছে স্বীকার করছি।

আরও বাড়বে, গিজলার গালে হাত বুলিয়ে টমাস বললো, তোমাকে একটা সুখবর দি, তুমি হয়তো কালকেই জানতে পারবে—

স্বরে কৌতূহল প্রকাশ করে গিজলা বললো, কী সুখবর?

আগামী সপ্তাহ থেকে তুমি হবে আমাদের ব্যালের ব্যালেরিণা। তা না হলে দর্শকদের আর খুশি রাখা যাবে, না।

বাধা দিয়া গিজলা জিজ্ঞেস করলো, আর ফ্রেডারিকা?

টমাস হেসে বললো, আর পাঁচজন সাধারণ নর্তকীর মতো ও আমাদের দলে নাচবে।

খুশিতেগিজলার ইচ্ছে হলো টমাসের বুকের ওপর ভেঙে পড়ে। জয়ের গৌরব অনেক বেশি তার। সে তার কাছ থেকে ছলনা করে মাত্র একজন মানুষকে ছিনিয়ে নিয়েছে কিন্তু গিজলা নিজের প্রতিভা

দিয়ে জয় করে নিলো অসংখ্য দর্শকের মন। এবার থেকে তাই যেন সে চিরদিন করতে পারে। কোনো বিশেষ মানুষ তার কাছে যেন আর কখনও কাজের চেয়ে প্রিয় না হয়ে ওঠে।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে গিজলার মন থেকে সকলের ওপর সব রাগ অভিমান মুছে গেল। বাইরের লোকের কাছ থেকে এতো বেশি প্রশংসা সে পেলো যে তার মনে কোনো দৈন্য রইলো না।

সারা লুনেমবুর্গ শহরে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় পড়েছে তার ছবি। তার নাচ দেখতে ছুটে আসে অসংখ্য লোক। ব্যালের ম্যানেজার তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে যায়, আমার দলের ছোট্ট ব্যালেরিণা সকলকে ছাড়িয়ে গেল। এবার ভাবছি বার্লিনে গিয়ে কিছুদিন নাচ দেখাবো।

কবে যাবো বার্লিনে? দেশ ঘুরে বেড়াতে আমার খুব বেশি ইচ্ছে করে।

ম্যানেজার হেসে বলে, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক। আমাদের আর একটু তৈরী হয়ে নেয়া দরকার। বার্লিন বড়ো শহর। সেখানে আরও অনেক দল আছে কিনা।

থাক না, গর্বের হাসি হেসে গিজলা বলে, আমি সকলকে ছাড়িয়ে যাবো।

ম্যানেজারও হেসে বলে, তোমার ভরসাতেই তো আমি বার্লিনে দল নিয়ে যেতে সাহস করছি।

শুধু বার্লিনে নয়, আব্দারের সুরে গিজলা বলে, আমি ইংল্যাণ্ডেও যেতে চাই।

আমারও খুব ইচ্ছে আছে ওসব দেশে যাবার। কিছুদিন আমাকে সময় দাও ভেবে দেখি।

ফ্রেডারিকার সংগে গিজলা আজকাল কথা বলে না। রাগ আছে বলে নয়, তার মনে হয় সে বোধহয় তাকে চেনে না। কিন্তু গিজলার এই সাফল্য সহ্য করতে পারলো না ফ্রেডারিকা। কার্লের সংগে সেও একদিন অন্য দেশে অন্য কোনো ব্যালের দলে চলে গেল।

যাবার দিন কার্ল গিজলার সংগে দেখা করে বলে গেল, গিজলা সময় ফুরোলো · আমার। আজ এখান থেকে আমার যাবার দিন। তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম।

গিজলা হেসে বললো, আবার নিশ্চয়ই তোমার সংগে কোনো-দিন না কোনোদিন কোথাও না কোথাও দেখা হবে।

জানি না, তবে তোমার দেখা পেতে আমার সব সময় ইচ্ছে করবে।

রসিকতার সুরে গিজলা বললো, আমার দেখা পেতে হলে ভবিষ্যতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না তোমায়। বড়ো স্টেজের ব্যালেরিণার সন্ধান পেতে কারোর দেরি হয় না।

গিজলার সাফল্য কামনা করে কার্ল বিদায় নিলো। সে চলে যেতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজের কাছে গিজলার সমস্ত খ্যাতি যেন ম্লান হয়ে গেল। মনে হলো, সব মিথ্যা। এ পৃথিবীতে খ্যাতির কোনো মূল্য নেই। সব তুচ্ছ করে কার্লের সংগে চলে যেতে ইচ্ছে করলো তার।

কিন্তু শেষ অবধি গিজলার বার্লিনে যাওয়া হলো না। দেশে অনেকদিন থেকেই কুচকাওয়াজ চলছিলো, হঠাৎ তা এতো বেশি বেড়ে গেল যে লোকের আর কোনোদিকে মন দেবার সময় রইলো না। অশান্তি আর উত্তেজনায় সব গৃহ বিচলিত হয়ে

উঠলো। লোকের মুখে মুখে শুধু ফিরতে লাগলো জার্মানীর সর্বময় কর্তা অ্যাডলফ হিটলারের নাম।

দেশের কোনো তরুণ অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না, যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে হবে প্রত্যেককে। যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ বাধতে পারে তাই অ্যাডলফ হিটলারের মতে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবে আজ প্রত্যেককে কঠোর দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করতে হবে।

জিনিষপত্রের দাম বাড়তে লাগলো হু হু করে। প্রচণ্ড উন্মাদনায় মানুষ ক্ষেপে উঠলো যেন। কারোর কোনোদিকে মন দেবার সময় নেই। কে ব্যালে দেখবে! দিনরাত এখানে ওখানে সভা বসছে, নানা রকম মন্ত্রণা চলছে, কতো বিরুদ্ধমতের লোক গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাচ্ছে প্রতিদিন। হিটলারের তালে তাল মিলিয়ে প্রত্যেককে জার্মানীর জয়গান গাইতেই হবে। যে অন্য কথা বলবে তাকে হয় দেশ ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে, নয় মৃত্যুদণ্ড নিতে হবে।

ব্যালে ছেড়ে টমাসকেও চলে যেতে হলো একদিন। তাকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে হলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আরও অনেককে চলে যেতে হলো।

ফলে ব্যালেরিণা হলেও গিজলার মাইনে খুব বেশি বাড়লো না। এমন কি, তার যা পাওনা তাও সে নিয়মিত পেতো না। তার মাইনে প্রায়ই বাকি পড়তে লাগলো।

যুদ্ধ যে কী আর তা বাধলে দেশের চেহারা ঠিক যে কেমন হয় সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা গিজলার ছিলো না। যদি থাকতো তাহলে সে হয়তো বারবার মনে মনে প্রার্থনা করতো, যেন কিছুতেই যুদ্ধ না বাধে।

আজ লণ্ডনে বসে একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো তার সেসব ভয়ঙ্কর দিনের কথা মনে পড়ে। এক একদিন এক একজনের মৃত্যু সংবাদ আসতে লাগলো। ব্যালের দল ভেঙে গেছে তখন। কাগজে কার্লের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হলো। শত্রুর বোমায় সে শেষ হয়ে গেছে। টমাসও ফিরে এলো না আর। অনাহারে অনিদ্রায় ভাবনায় ভাবনায় গিজলার দিন কাটতে লাগলো। লুনেমবুর্গকে গ্রামের মতো মনে হয়। লোক সংখ্যা এতো কমে গেছে। সেই সময় নানারকম কাজ বাধ্য হয়ে গিজলাকে করতে হয়েছিলো। কখনো নার্সের কাজ, কখনো ওষুধের দোকানে চাকরি, কখনো বা সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এটা ওটা বিক্রি করেছে। কিন্তু এসব করেও খাওয়া জুটছিলো না তাদের। খাবার নেই দেশে। যা আছে তা ওদের জন্যে নয়।

যেখানে ব্যালে হতো সে-বাড়ি আজ বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুতেই গিজলা চোখের জল চাপতে পারে না। কেন এমন হলো? কে তার দেশের এই সর্বনাশ করলো? এখন কোথায় যাবে সে? কী করবে? তার মুখের সামনে থেকে খাবারের গ্রাস কে যেন সহসা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন হতাশা ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে জানে না কাল তার কোনোরকম খাওয়া জুটবে কি না।

বিদেশী সৈন্যরা এসে সারা দেশ দখল করেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে গিজলার দেহে মনে আগুন জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে যে-কজন আজও বেঁচে আছে তাদের সংগে এক হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে এদের চোখের সামনে থেকে দূর করে দেয়। গিজলা লক্ষ্য করেছে ঠিক তেমনি আগুন আরও অনেক জার্মানের চোখে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো দুঃখ এই যে কিছু করবার উপায়

নেই তাদের। তবু এমনি করে এদের দয়ায় তারা বেশিদিন কিছুতেই বেঁচে থাকবে না। প্রাণপণে পরিশ্রম করে আবার তাদের তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—এমন কথা এর মধ্যেই তার অনেক বন্ধুবান্ধবের মুখে গিজলা শুনেছে। দেখা যাক কী হয়। এখন ধৈর্য ধরে মুখ বুজে সকলের সব অপমান সহ্য করা ছাড়া বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই। তাই গিজলা প্রহর গোণে, আবার কবে দিন ফিরবে, আবার কবে সে অসংখ্য দর্শকের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে। কিন্তু বৃথাই তার কাল গোণা। শুধু অভাব বেড়ে যায় প্রতিদিন। দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সে কোনো কাজ পায় না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গিজলা কেমন যেন হয়ে গেল। সে জানে এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করা যায় না, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। আজ যে বাড়িতে মা বাবার সংগে সে বাস করছে, কে জানে কাল সে বাড়ি তাকে ছেড়ে যেতে হবে কিনা। এখন সবই অনিশ্চিত। কে কখন কোথায় ছিটকে পড়ে ঠিক নেই। তাই এখন কিছু পাবার আশা করে না গিজলা। যখন খাবার পায়, কোনোদিকে না তাকিয়ে, কারোর কথা না ভেবে দারুণ ক্ষুধায় নিমেষে তা শেষ করে দেয়। আর যেদিন কিছু পায় না, সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শুধু আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

সরকার থেকে অবশ্য খাবার বিতরণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যাদের বহু সৌভাগ্য তারা তা পায়। মা বাবার সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো কোনোদিন শুধু তিন টুকরো শুকনো রুটি পেয়েছে। কিংবা কোনোদিন অনেক-ক্ষণ অপেক্ষা করবার পর হঠাৎ শুনেছে সব শেষ হয়ে গেছে, আজ

আর কেউ কিছু পাবে না। হতাশায় 'কিউ' ভেঙে গেছে। বাচ্চারা ক্ষিধেয় চিৎকার করে কাঁদছে, মায়ের চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়ছে। কিছুই করবার নেই।

এমনি করে গিজলা আর দিন কাটাতে পারছে না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে তার। সে শুধু বিশ্রাম করতে চায়। রোজ খাবারের আশায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার শক্তি আর তার নেই। তবু ক্লান্ত দেহ নিয়ে তাকে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হয়।

ওদিকে তার বাবা এখন আর কিছুই করতে পারে না। দোকান উড়ে গেছে বোমায়। তার বাবা কেমন জড়ের মতো হয়ে গেছে। আর কথা বলতে পারে না। শুধু অবাক হয়ে করুণ চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে টপ টপ করে তার চোখ বেয়ে জল পড়ে।

গিজলার মা আর বন্ধু বান্ধবের সংগে বেরোয় না। তারা কেউ বোধহয় আর বেঁচে নেই। যারা আছে তারা পঙ্গু হয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে মা বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর ঝগড়া করে না তার সংগে। যে কথা বলতে পারে না, যে একেবারে নির্বিকার তার সংগে কে তর্ক করবে! কিন্তু গিজলা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখে, যখন তার বাবা 'কিউ'-এ রুটির আশায় দাঁড়িয়ে কিছু পায় না তখন মা আর মেয়ে নিজেদের ভাগ থেকে কিছু নিয়ে বাবার সামনে দেয়। আশ্চর্য, বুড়ো ছোঁয় না সেগুলো। ঘৃণায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভাবটা বোধহয় এই রকম, মরি তাও স্বীকার তবু তোমাদের দেয়া খাবার খেয়ে বাঁচবো না।

মা বলে, যাক গে, মরুক লোকটা না খেয়ে, আমার কী! এ

সময় গিজলা কিন্তু বাবার দিকে সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। সে ভাবে বিদেশীদের দেয়া খাবার সেও যদি তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বলতে পারতো, মরি তাও স্বীকার তবু তোমাদের দেয়া খাবার খেয়ে বাঁচবো না—তাহলে হয়তো এই নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝে বাস করেও সে কিছু শান্তি পেতো। কিন্তু কেমন করে সেকথা বলবে গিজলা? সে ভালো করে চলতে পারে না, তার কানে এখনও বোমার শব্দ ভেসে আসে, কথায় কথায় তার মাথা ধরে যায়, গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না। মূক গিজলা শুধু আহার্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

এমন সময় এক বিজ্ঞপ্তি বের করলো সরকার। ইচ্ছে করলে অন্যান্য দেশে মেয়েরা কাজ নিয়ে যেতে পারে। সপ্তাহে দু পাউণ্ড মাইনে আর থাকা খাওয়া শুধু। অন্য কোনো কাজ নয়, শুধু ঝিয়ের কাজ নিয়ে তারা বিদেশে যেতে পারে। এ কাজ পাওয়া সোজা নয়। বিজ্ঞপ্তি বেরোবার সংগে সংগে মেয়েদের লম্বা 'কিউ' হলো সরকারী দপ্তরে। সব যুবতী মেয়েরা ঝিয়ের কাজ নিয়ে বিদেশে যেতে চায়।

গিজলা ঠিক করলো সেও যাবে যেখানে হোক। দুবেলা দুটো খেতে পাবে, এর চেয়ে বড়ো আশ্বাস তার কাছে এখন আর কিছু নেই। বিশৃঙ্খল ধ্বংস স্তূপের মাঝে সে আর এক মুহূর্ত থাকতে চায় না। তার চোখের সামনে থেকে সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। মাইনে পাক বা না পাক, কেউ যদি তাকে প্রত্যহ খাওয়া দেয় তাহলে তার জন্যে সে যে কোনো কাজ করতে রাজি। অন্যান্য মেয়েদের মতো সরকারী দপ্তরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো গিজলা। তার চেহারা ভালো। তাই ভিড়ের মধ্যে থাকলেও অনেক চোখ তার ওপর পড়লো। কাজ জোগাড় করতে দেরি হলো না তার।

লণ্ডনে এসে মিসেস কোহেনের বাড়ি আর সেখানকার শান্ত পরিবেশ দেখে গভীর শান্তিতে গিজলার বুকে ভরে গেল।

এখানে অভাবের বীভৎস রূপ চোখে পড়ে না। সারাদিনে খাওয়া জুটবে কিনা সেকথা ভেবে এখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না। এখানে ঠিক সময়ে পেট ভরা খাওয়া পাওয়া যায়। আর কাজও এমন কিছু বেশি নয়। যদিও বাচ্চাকে মানুষ করবার কোনো অভিজ্ঞতা গিজলার নেই, তবু ছোট ছেলের সংগে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াতে গিজলার মন্দ লাগে না। এ বাড়িতে এসে অতীতের সব দুঃখ কষ্ট সে যেন আস্তে আস্তে ভুলে গেল। এলফ্রিডার সংগে মনের নানা কথা বলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গিজলা নিজেকে পুরোপুরি ভাবে এ বাড়িতে মানিয়ে নিলো। ব্যালে, দর্শকের উচ্ছ্বসিত করতালি, তার সাফল্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—এসব কথা তার এখন আর ভালো মনে পড়ে না। সুখ-স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মতো মাঝে মাঝে তার শুধু অতীতের দিনরাতগুলি মনে পড়ে। কিন্তু তা ভেবে বেশিক্ষণ অলস মুহূর্ত কাটাবার উপায় নেই। মিসেস কোহেনের মেজাজ কখন বিগড়ে যায় বলা কঠিন। তার স্বভাব গিজলা ঠিক বুঝতে পারে না। দেশে সে দারুণ দুরবস্থার মধ্যে ছিলো সেকথা সত্যি, কিন্তু মুখের ওপর কঠিন কথা বলে কখনও কেউ অপমান করে নি। মিসেস কোহেন প্রায়ই তাদের দুজনকে যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করে।

একদিন বাচ্চার সংগে খেলতে খেলতে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফের-বার সময় তার বলের কথা গিজলার খেয়াল ছিলো না।

পরদিন সকালে বাচ্চার বল দেখতে না পেয়ে মিসেস কোহেন বললো, ওর বলটা কোথায় গিজলা ?

বল ? কই আমি তো জানি না।

উত্তর শুনে রাগে মুখ লাল হয়ে গেল মিসেস কোহেনের, তোমাকে তাহলে আমি অতো টাকা ভাড়া দিয়ে আনিয়েছি কেন ? সামান্য কাজ, একটু মন দিয়ে করতে পারো না ?

মন দিয়েই তো করবার চেষ্টা করি—

আমার মুখে মুখে কথা বলো না, মিসেস কোহেনের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাজলো, আর কখনও এরকম জিনিষপত্র যেন না হারায়। দিনরাত দুজনে মিলে শুধু গল্প করে কাটাও। আমি সব খবর রাখি। দুই দেশ থেকে দুজন নিয়ে এলে আমার অনেক সুবিধা হতো।

মিসেস কোহেনের আড়ালে গিজলা এলফ্রিডাকে বললো, এমন গালাগাল খেয়ে থাকতে হবে নাকি ?

এলফ্রিডা ম্লান হেসে বললো, উপায় কী ! মুখের ওপর তর্ক করলে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাবে কোথায় ?

কথা শুনে ভয়ে গিজলার মুখ শুকিয়ে গেল। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা সে ভাবতে পারে না। যতো খুশি মিসেস কোহেন গালাগাল করুক। তবু তো এ বাড়ি তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। একটা পূরো ঘর, নরম বিছানা আর ঠিক সময় খাওয়া। এ নিশ্চিত জীবনে আর কী প্রয়োজন গিজলার !

প্রথম প্রবেশ করে এ বাড়িকে গিজলার শান্তির নীড় মনে হয়েছিলো। কিন্তু কয়েকদিন পরই ভুল ভেঙে গেল তার। এ বাড়ির কর্তা গিন্নীর মনে শান্তি নেই। স্বামীর ওপর রেগে গিজলা আর এলফ্রিডার ওপর মিসেস কোহেন অকারণে রাগ প্রকাশ করে।

মিসেস কোহেনের চেহারা এমন কিছু ভালো নয়। লম্বা নাক, গোল মুখ আর ছোটো ছোটো চোখ তার। তাকে দেখলে তার স্বামীর চেয়ে বেশি বয়স বলে মনে হয়। মিস্টার কোহেনের চেহারা কিন্তু সুন্দর। মিসেস কোহেনের পাশে তাকে একেবারেই মানায় না। গিজলা বিস্মিত দৃষ্টিতে মিস্টার কোহেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু রাত্তিরে এ বাড়িতেও মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল বাধে। খুব ছেলেবেলা থেকে এমন বিরোধে গিজলা অভ্যস্ত। মা বাবার কলহ শুনে যখন গভীর রাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে যেতো তখন চাপা অস্বস্তিতে সে ছটফট করতো, সারারাত চমকে চমকে উঠতো। এখানে স্বামী স্ত্রীর কলহ শুনে সে চমকে ওঠে না বটে কিন্তু ভীষণ অবাক হয়। মা বাবার মনের মিল অনেক কারণে ছিলো না। বাবার বয়স মার চেয়ে অনেক বেশি, তার ওপর উপার্জনও যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু মিসেস কোহেনের তো তেমন কোনো কারণ নেই। তাহলে কেন সে অমন স্বামীর ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এই কিছুদিন আগে মিসেস কোহোনের তীক্ষ্ণ স্বর শুনে গিজলার ঘুম ভেঙে গেল। তাদের ঘর ঠিক তার পাশে। সেই নিঝুম রাত্তিরে স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকটি কথা তার কানে ভেসে এলো।

তোমার আত্মসম্মান জ্ঞান একেবারেই নেই। আমাকে দোকানে লোকে নানা রকম প্রশ্ন করে, বলে দিতে পারো তাদের আমি কী উত্তর দেবো ?

মৃদু স্বরে মিস্টার কোহেন বললো, পরের ব্যাপারে যাদের বেশি কৌতূহল তাদের কথার কোনো উত্তর না দেয়াই উচিত।

কিন্তু তোমার জন্যে আমি লোকের কাছে অপমানিত হতে পারবো না। ওসব যে সে মেয়ের সংগে যেখানে সেখানে ঘুরে না বেড়ালে কি তোমার কিছুতেই চলে না ?

না, কারোর জন্যে আমি আমার চলাফেরা বদলাতে পারবো না। তুমি রোজ রোজ আমাকে এমন করে বিরক্ত করো না।

আমি তাহলে পুলিশের সাহায্য নেবো। আমাকে এমন অপমানের মধ্যে রাখবার কোনো অধিকার তোমার নেই।

ছেলেমানুষী করো না, নরম স্বরে মিস্টার কোহেন বললো, তোমাকে সত্যি আমি খুব ভালোবাসি।

তাহলে এক একবার এক একজন বাজে মেয়েকে নিয়ে তুমি কর্ণওয়াল কিংবা ডেভন বেড়াতে যাও কেন ?

ওটা আমার স্বভাব। ছেলেবেলা থেকে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে বলতে পারো। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি না সেকথা ভাবো কেমন করে ?

ছাই বাসো, আমি জানি আমার চেহারা ভালো নয় বলে তোমার মনে তৃপ্তি নেই, আবার চিৎকার করে উঠলো মিসেস কোহেন, কিন্তু আর আমি তোমার অত্যাচার সহ্য করবো না। সারাদিন চাকরি করে এসে তোমার সংসার দেখাশোনা করতে পারবো না—

যা খুশি করো। কিন্তু এখন আমাকে ঘুমোতে দাও। রোজ রোজ চেঁচামেচি ভালো লাগে না। ঝিগুলো সব শুনতে পায়। ওরা কী ভাবে বুঝতে পারো না ?

ভাবুক। ওদের কথা খুব খেয়াল থাকে তোমার। আর আমাকে যে নানা কথা শুনতে হয় সেকথা কেন মনে রাখতে পারো না তুমি ?

আরে দূর—

দড়াম করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো খাট থেকে কে যেন পড়ে গেল। গিজলা চমকে বিছানার ওপর উঠে বসলো। ওরা মারামারি করছে না কি? ভয় হলো তার। ইহুদীদের ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছে না সে। কেউ কাউকে মেরে ফেলবে না তো? তার একবার ইচ্ছে হলো আস্তে পা টিপে টিপে গিয়ে এলফ্রিডার ঘুম ভাঙায়।

পরদিন এলফ্রিডাকে ব্যাপারটা বলতেই সে হেসে উঠে বললো, অমন গোলমাল ওদের প্রায়ই হয়। সুযোগ পেলে মিস্টার কোহেন মাঝে মাঝে আমার সংগেও হাসি ঠাট্টা করে।

গিজলা বললো, তোমার সৌভাগ্য। আমার কখনও সে-সুযোগ হলে আমি ওকে বলবো আমাকে দেশবিদেশ ঘুরিয়ে আনতে।

সুযোগ তোমার হবেই, এলফ্রিডা হেসে বললো, কিন্তু খুব সাবধান, গিন্নী টের পেলে সংগে সংগে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেবে।

আমি অতো বোকা নই যে ধরা পড়বো, গিজলা আরও আস্তে এলফ্রিডাকে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু মিসেস কোহেন এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো চেঁচামেচি করে কেন?

ওটা ওর স্বভাব। আমাদের সংগেও সব সময় খিটখিট করে দেখতে পাওনা?

তা করুক। কিন্তু মিস্টার কোহেন তো ওকে খুব আরামে রেখেছে, কাজেই ও যদি অন্য মেয়েদের দিকে একটু মন দেয় তাতে ক্ষতি কী?

আমিও সেকথা বুঝতে পারি না। মিসেস কোহেনের চেহারা

ভালো নয় বলে ও ভাবে স্বামী তাকে ভালোবাসে না। তাই সব সময় ওকে সন্দেহ করে।

আমাদের অবস্থায় পড়লে বোধ হয় বুঝতে পারতো যে স্বামী এমন আরামে রাখতে পারে তার বাহাদুরী কতো!

এলফ্রিডা বললো, খুব যে আরামে রেখেছে তা ভেবো না, দেখতেই তো পাও যে মিসেস কোহেন চাকরি করতে যায়।

কিন্তু ও কেন দোকানে চাকরি করে?

এলফ্রিডা হেসে বললো, অন্য মেয়েদের জন্যে অনেক খরচ করে বলে স্বামী সব সময় ওকে সংসার খরচের টাকা দিতে পারে না—

ভাগ্যিস চাকরি করতে যায় মিসেস কোহেন, সারাদিন বাড়ি বসে থাকলে আমাদের আরও বেশি গালাগাল খেতে হতো।

সেই এক কথা বললো এলফ্রিডা, উপায় কী! আমার এ ভাবে দিন কাটাতে আর ভালো লাগছে না। আর এক রকম কাজের সন্ধান পেয়েছি, দেখি কী হয়।

কৌতূহলী হয়ে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, কী কাজ?

মিডলসেক্স হাসপাতালে আমাদের মতো অনেক জার্মান মেয়ে নাকি নার্সের কাজ পাচ্ছে।

অবাক হয়ে গিজলা বললো, কিন্তু আমরা তো ও কাজের কিছুই জানি না।

তাতে কিছু যায় আসে না। হাসপাতালে গেলে ওরা সব শিখিয়ে নেয়।

হাসপাতালের নাম শুনে গিজলার মনে কোনো উৎসাহ জাগলো না। তাই সে ম্লান স্বরে বললো, এর চেয়ে ও কাজ কি খুব বেশি ভালো হবে?

অনেক ভালো হবে। আর তা ছাড়া কতো নতুন

লোকের সংগে আলাপ হবে। এখানে থেকে কী লাভ হচ্ছে আমাদের ?

তোমার তো তবু অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।

কোথায় আর ? একটু থেমে এলফ্রিডা বললো, যারা আছে তারা ইণ্ডিয়ান। ওরা সকলেই ছাত্র। পয়সা বেশি নেই ওদের।

গিজলা হেসে বললো, তা না থাক। সুশোভন কিন্তু খুব ভালো লোক। ও বোধহয় শিগগিরই আমাকে বিয়ে করতে চাইবে।

খুব জোরে হেসে এলফ্রিডা বললো, আমি অনেক ইণ্ডিয়ান দেখেছি। ওরা তেমন লোক নয়। তোমার চেয়ে সুন্দরী অন্য কারোর সংগে আলাপ হলেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।

কী ভেবে গভীর স্বরে গিজলা বললো, না না, সুশোভন তেমন লোক নয়।

ওরা সকলেই সমান। আর তোমাকেও বলি গিজলা, এক-জনের ওপর অতো বেশি নির্ভর করো না। জীবনে আমরা কিছুই পাই নি। তাই সুযোগ পেলেই আমাদের শুধু ভোগ করা উচিত।

গিজলা বললো, কিন্তু সুযোগ কোথায় ?

আসবে, অপেক্ষা করো।

আশা করতে আর ইচ্ছে করে না এলফ্রিডা। মাঝে মাঝে বুক যেন জ্বলে যায় আর ভীষণ যন্ত্রণায় মাথা দপদপ করে! তাই সুশোভনের কাছে ছুটে যাই। ওর কথা শুনতে শুনতে আমার জ্বালা অনেক জুড়িয়ে যায়—

সুশোভন অবশ্য লোক খারাপ নয়।

ওর মতো কথা আমাকে আর কেউ কখনও শোনায় নি। ও

যেন আমাকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়। আমি সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে যাই।

এলফ্রিডা মৃদুস্বরে বললো, জানি। সুশোভনের অনেক গুণ আছে। ও ওর অন্যান্য বন্ধুদের মতো স্বার্থপর নয়। যা হোক তোমার প্রথম কাজ হলো ওর কাছ থেকে ভালো করে ইংরেজী শিখে নেয়া। কারণ বুঝতেই তো পারো ভাষা না জানলে যে কোনো ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

গিজলা শুধু বললো, জানি।

এলফ্রিডার সুশোভনের ওপর একটু রাগ ছিলো। আর সেই কারণে গিজলার ওপর ঈর্ষাও জেগেছিলো তার। ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনোর ওপর ঝোঁক এলফ্রিডার। অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধি বেশি বলে মনে মনে তার বেশ গর্ব ছিলো। তাই সে আশা করেছিলো সুশোভন গিজলার চেয়ে তাকে বেশি সমাদর করবে আর তার সংগে কথা বলে আরও আনন্দ পাবে। গিজলার মতো মেয়ের সংগে সুশোভন কী কথা বলে এলফ্রিডা তা ভেবে পায় না। তার মনে হয় সে তাকে যদি অমন যত্ন করে লেখাপড়া শেখাতো তাহলে সার্থক হতো সুশোভনের পরিশ্রম। এবং সে নিজেও যথেষ্ট পরিমাণে তার মূল্য দিতে পারতো। গিজলার যে লেখাপড়ায় কোনো উৎসাহ নেই সেকথা সুশোভনের মতো বুদ্ধি-মান লোক কেন বুঝতে পারে না। এক অবস্থায় পড়ে এক বাড়িতে কাজ করতে হয় বলে আজ গিজলা এলফ্রিডার মতো মেয়ের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো অবস্থায় দেশে থাকলে হয় তো অমন মেয়ের সংগে কোনোদিনও এলফ্রিডার আলাপ হতো না। তাই সে সুশোভনের সংগে গিজলার সম্পর্কের কথা ভেবে অবাক হয়। কেন এমন হয়? সব ছেলেদের ওপর হঠাৎ বিশ্বাস

হারিয়ে ফেলে সে। মনে হয় রূপ ছাড়া মেয়েদের আর কোনো কিছুর মূল্য ছেলেরা দিতে পারে না। রূপ ছাড়া গিজলার আর আছে কী! সামান্য শিক্ষাও নেই তার। তাহলে কী দেখতে পেলো ওর মধ্যে সুশোভন? হঠাৎ তার ওপর বিতৃষ্ণায় এলফ্রিডার মন ভরে গেল। ওকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে সব মেয়ে বিদ্যার মূল্য দেয় না। যারা দেয় তারা যে সব সময় রূপসী হবে এমন কথা বলা যায় না।

গিজলাকে এলফ্রিডা জিজ্ঞেস করলো, আমি যে হাসপাতালে কাজের চেষ্টা করছি সেখানে কি তোমার কথাও বলবো?

মাইনে যদি বেশি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই বলবে।

হ্যাঁ, মাইনে বেশি পাওয়া যাবে। আর কাজও যে এর চেয়ে অনেক ভালো সেকথা আগেই বলেছি।

তবে নিশ্চয়ই আমার জন্যে চেষ্টা করবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এলফ্রিডা। আমি তো এখানে কাউকে চিনি না।

একটু রেগে এলফ্রিডা বললো, চেনবার চেষ্টা কর। শুধু একজনের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে তো চলবে না। তুমি তো আর ইস্কুল টিচার হবে না।

এলফ্রিডার কথা শুনে মনে মনে গিজলা হাসলো। তার জ্বালা কোথায় সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তার আছে। কিন্তু সে একটি কথাও তাকে বললো না। ঠিক করলো সুশোভনের কথা তাকে আর বেশি বলবে না।

নাম এপিং ফরেস্ট। অসংখ্য বড়ো বড়ো গাছের সারি। চারপাশে হারিয়ে যাবার সঙ্কেত। গভীর অরণ্য বলে মনে হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে দিন কাটাতে আসে অনেক প্রেমিক প্রেমিকার

দল। লোক চক্ষুর অন্তরালে এখানে হয় কতো হৃদয়ের বিনিময়। কেউ বাধা দেবে না, কেউ বিরক্ত করবে না। শুধু সাক্ষী থাকে মৌন গাছ, মাঝে মাঝে মর্মর তুলে তারা সমর্থন করে প্রেমিকের গুঞ্জন। কেনসিংটন থেকে এপিং ফরেস্টে আসতে খুব বেশি সময় লাগে না। টিউব ট্রেনেই আসা যায়। সুশোভন কোনোদিনও এখানে আসেনি। সম্প্রতি বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে এপিং ফরেস্টের সন্ধান পেয়ে একদিন দুপুরে গিজলাকে সংগে নিয়ে টিউব ট্রেনে চড়ে বসলো। জংগলে পৌছোতে পুরো এক ঘণ্টাও লাগলো না তাদের।

গ্রীষ্মকাল হলেও সেদিন খুব বেশি ভিড় ছিলো না সেখানে। প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। গিজলা সুশোভনের হাত ধরে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে চলতে লাগলো। বেশ গরম পড়েছে তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার সারা দেহমন।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, হেঁটে বেড়াবে, না বসে বসে গল্প করবে গিজলা?

বসে বসে গল্প করবো, ওই যে ওখানে চলো—বড়ো বড়ো গাছে ঘেরা একটা ফাঁকা গোল জায়গায় এসে বসলো ওরা দুজনে। হাল্কা রোদ্দুর উঠেছে, দূরে হাওয়ায় ফুলগুলি দুলে উঠছে।

গিজলা বললো, কিছু খাবে নাকি তুমি? আমি আজ অনেক খাবার কিনে এনেছি।

সুশোভন গিজলার পাশে বসে বললো, না, এখন আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ওসব তো আমার আনবার কথা। তুমি শুধু শুধু খরচ করতে গেলে কেন?

হেসে গিজলা বললো, উপরি রোজগার করেছি। জানো সুশোভন, পুরো এক পাউণ্ড বখশিস পেয়েছি আমি।

বখশিস? অবাক হয়ে সুশোভন বললো, কী ব্যাপার? তোমাকে বখশিস দিলো কে?

আমি যে ঝিয়ের কাজ করি। কাল মিস্টার কোহেন তার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছিলো। তারা যাবার সময় আমাকে আর এলফ্রিডাকে এক পাউণ্ড করে টিপ্‌স দিয়ে গেছে। তোমার জন্যে তাই খাবার কিনে ফেললাম।

গিজলার কথা শুনে সুশোভন অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তার মনে যেন হঠাৎ কঠিন আঘাত লাগলো। সে ভাবতে চেষ্টা করলো তার যদি গিজলার মতো অবস্থা হতো আর কেউ তাকেও ঠিক এমনি করে বখশিস দিয়ে যেতো তাহলে কী মনোভাব নিয়ে সে তা গ্রহণ করতো। কিছুতেই বোধ হয় গিজলার মতো হাসি মুখে সেটা গ্রহণ করতে পারতো না। সে-পাউণ্ডের নোট পীড়া দিতো সুশোভনকে।

কিন্তু গিজলাই বা কেমন করে হাত পেতে অতো সহজে ও টাকা নিতে পারলো। সে কি তার অতীতের সব কথা একেবারে ভুলে গেছে? ও টাকায় খাবার কিনে আনন্দের সংগে কেমন করে সে খেতে পারে?

সুশোভনের দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে গিজলা বললো, খাও সুশোভন।

না না—

ভয় নেই। আমি ফ্লাস্কে চা নিয়ে এসেছি।

গিজলার মুখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন বললো, তুমি ওদের কাছ থেকে বখশিস নিলে কেন?

সুশোভন কেন একথা বলছে তা বুঝতে না পেরে গিজলা বললো, বাঃ, ওরা খুশি হয়ে দিলো যে!

তুমি ফিরিয়ে দিলে না কেন? গম্ভীর মুখে সুশোভন বললো, একজন ব্যালেরিণা হয়ে এমনি ভাবে বখশিস নেয়া কি তোমার উচিত?

কিন্তু এখন তো আমি ব্যালেরিণা নই সুশোভন। এখন আমি কোনো বড়ো লোকের বাড়ির একজন ঝি মাত্র।

বুঝি সব, সুশোভন যেন আপন মনে বললো, একদিন স্টেজে আশ্চর্য নাচ নেচে যে অনেক ফুলের তোড়া আর আরও নানারকম উপহার পেয়েছে আজ ঝিয়ের কাজ করে সে বখশিস পেয়ে খুশি হচ্ছে সেকথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না গিজলা।

উষ্ণস্বরে গিজলা বললো, আমিও তো অনেক কিছুই ভাবতে পারি নি। আজও আমার একমাত্র ভাবনা, গিজলা টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, বেঁচে থাকতে হবে—তা সে যেমন করেই হোক। এখন ব্যালেরিণা সেজে বসে থাকলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। ঝিয়ের কাজ ছাড়া এখানে আমি আর কী করতে পারি বল?

সুশোভন তাড়াতাড়ি বললো, আমাকে ভুল বুঝো না গিজলা। আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে কোনো কথা বলি নি। তুমি এখানে এই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছো সেকথা ভেবে সব সময় দুঃখে আমার বুক ভরে যায়।

গিজলা মৃদুস্বরে বললো, সেকথা বুঝতে পারি বলে তোমার কাছে ছুটে আসবার জন্যে ব্যাকুল হই। কিন্তু আমার জন্যে তুমি একটু বেশি ভাবো সুশোভন। আমি এখানে খুব আরামে আছি। ঠিক সময় খেতে পাচ্ছি, নরম বিছানায় ঘুমোতে পাচ্ছি। দেশে থাকতে কল্পনা করতে পারি নি এখানে আমি এতো ভালো ভাবে থাকতে পারবো—

কিন্তু আরও অনেক ভালো ভাবে তোমার থাকা উচিত গিজলা—

বাধা দিয়ে গিজলা বললো, সেকথা এই মুহূর্তে আমি আর ভাবতে পারি না সুশোভন। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না আমি কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছি। আমি যে বেঁচে আছি তাই ঢের, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গিজলা বললো, অ্যাডলফ হিটলার—লোকটা সমস্ত দেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিলো, অসংখ্য লোককে পিষে মারলো, শান্তির সংসার তছনছ করে দিলো—তবু বাঁচবো—বাঁচতে হবেই। মরবার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না সুশোভন। অনেক মরা লোকের মধ্যে থেকে বেঁচে থাকবো বলে এখানে পালিয়ে এসেছি। এখন কে আমাকে ব্যালেরিণা ভেবে আদর করলো আর ঝি ভেবে অবহেলা করলো সেসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমি যে বেঁচে আছি এই শুধু সত্যি—এই বেঁচে থাকাই আমার সব!

গিজলার কথা শুনে অবাক হয়ে সুশোভন বললো, আমি সব বুঝতে পারি গিজলা। কিন্তু এমন করে তুমি দিন কাটাচ্ছো ভাবলে আমার কাছে সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যায়।

গিজলা নির্বিকারভাবে বললো, উপায় কী!

উপায় আছে।

কী বল?

তুমি এসে আমার সংগে থাকো।

তা হয় না। তাহলে আমাদের দুজনকে পুলিশ ধরবে।

কেন ধরবে?

কারণ আমি কী ভাবে উপার্জন করি সেটা পুলিশকে জানাতে হয়—

কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর ?

সেটা অবশ্য আলাদা কথা, একটু চুপ করে থেকে গিজলা হেসে বললো, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবার কথা ভাবছো নাকি সুশোভন ?

লজ্জা পেয়ে সুশোভন তাড়াতাড়ি বললো, না না।

আমি তাই তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সংগে এতো ঘুরি, এতো কথা বলি, তুমি আমার জন্যে এতো কর, অথচ আশ্চর্য কখনও আমার কাছে কিছু চাওনা। তোমার মতো পণ্ডিত লোকের দেখা আমি এর আগে আর পাই নি। তাই তোমার ব্যবহারে অবাক হই।

মৃদু হেসে সুশোভন বললো, ওকথা থাক। আমিও তোমাকে যতো দেখছি ততো অবাক হচ্ছি।

দূর, আমাকে দেখে অবাক হবার কী আছে ?

জানি না। তোমার কথা শুনতে শুনতে তোমার কাছ থেকে আমিও অনেক কিছু শিখেছি গিজলা।

আমার কাছ থেকে তুমি আবার কী শিখলে সুশোভন ? আমি তো কিছুই জানি না।

সুশোভন হেসে বললো, তুমি যে কতো বেশি জানো তা নিজে জানো না। আমি তোমার কাছ থেকে এরমধ্যে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছি। তোমার সংগে আলাপ না হলে আমি তা এতো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতাম না।

অবাক হয়ে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, আমার কাছ থেকে তুমি কী শিখেছো সুশোভন ?

তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি, জীবনের মাধুর্য কোথায়। তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি, সামাজিক অব্যবস্থা আমাদের

দিন রাত ধ্বংস করে দিতে চায়, তাই আমরা যেমন হতে চাই তেমন হতে পারি না।

এসব কথা আমি তো জানি না, শূন্য চোখে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে গিজলা বললো, তুমি অনেক বেশি পড়াশুনো করেছো কি না তাই তুমি যতো জানো আমি ততো জানি না।

গিজলার একটা হাত কোলের ওপর নিয়ে সুশোভন বললো, একথা বোঝবার জন্যে বেশি পড়াশুনো করবার দরকার নেই। সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়—

গিজলা হাসলো, আজ কিন্তু তোমার কথা আমি একটুও বুঝতে পারছি না।

কেন? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা গিজলা, তুমি তো কিছুদিন আগে ব্যালের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তা করতে পারলে না কেন?

কারণ তো তোমাকে আগেই বলেছি।

আমি বলবো সমাজের অব্যবস্থার জন্যে তোমার এই পরিণতি। তুমি যা করতে চাও তা সমাজ তোমাকে করতে দিলো না। তুমি যা নও আজ তোমাকে তাই সাজতে হয়েছে।

ম্লান স্বরে গিজলা বললো, আমি তার জন্যে একটুও দুঃখিত নই সুশোভন। ঝি গিরি করে তবু তো বেঁচে থাকতে পারছি।

জানি। কিন্তু বেঁচে থাকাই সব সময় বড়ো কথা নয়। আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

হতাশ স্বরে গিজলা বললো, আমি জানি না আরও ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে কী করবো!

লেখাপড়া শিখলে সেকথা তুমি একদিন নিজেই বুঝতে পারবে। তাইতো আমি তোমাকে পড়াতে চাই।

তুমি যা বল আমিও তাই করি সুশোভন।

লক্ষ্মী মেয়ে, সুশোভন হেসে বললো, আজ ঝিয়ের কাজ করে তুমি বখশিস পেলে আমার হয়তো খারাপ লাগে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবি, তোমার হয়তো কোনো দোষ নেই। বাধ্য হয়ে তোমাকে যে করতে হচ্ছে তুমি তা মন দিয়েই করতে পারছো—এটা তো কম কথা নয়।

গিজলা বললো, আমার বন্ধু এলফ্রিডা বলে, উপায় কী! সত্যি তো আর কোন উপায় আমাদের নেই।

অমন কথা তাহলে কিছুতেই তার মৃত্যু হতে পারে না। ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিজলা হঠাৎ বললো, জানি না কেন, তোমার মুখ থেকে এসব কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে আর প্রায়ই ইচ্ছে করে তোমার সংগে এসে থাকতে।

এসে থাকলেই তো পারো।

বললাম যে তাহলে পুলিশ ধরবে।

পুলিশকে বললেই হবে, তুমি জেরাডসক্রেশে যেমন কাজ করছো আমার এখানেও তেমন কাজ করবে।

কিন্তু—গিজলা থেমে গেল।

বল গিজলা?

তারপর? তুমি যখন দেশে ফিরে যাবে আমার কী হবে তখন?

সুশোভন হাল্কা সুরে বললো, তুমিও যাবে আমার সংগে তখন।

তা কি হয় ?

কেন হয় না ?

তুমি কতো লেখাপড়া জানো—

তুমিও শিখে নেবে।

তোমার মতো অতো শিখতে আমি কোনোদিনও পারবো না।

চেষ্টা করে দেখ, আমার সংগে থাকলে তুমি সব শিখতে পারবে।

আমি আরও ভালো করে এখানে নাচ শিখতে চাই সুশোভন।

শেখো না কেন ? এখানে তো শুনি অনেক ভালো ভালো ব্যালের ইস্কুল আছে।

অনেক আছে কি না জানি না, হ্যামারস্মিথে একটা আছে জানি। ওরা খুব ভালো শেখায়।

সেখানে ভর্তি হয়ে যাও।

অনেক খরচ। অতো টাকা কোথায় পাবো ?

আমি দেবো, সুশোভন গিজলার কোলে মাথা রেখে বললো, কবে ভর্তি হবে বল ? হ্যামারস্মিথে গিয়ে যতো তাড়াতাড়ি হয় খোঁজ নাও, অন্য ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

কিন্তু, দুএক মিনিট চুপ করে থেকে গিজলা বললো, তাহলে তোমার অনেক অসুবিধা হবে যে—

আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি বুঝবো। তুমি শুধু যতো তাড়াতাড়ি হয় ভর্তি হয়ে যাও।

গিজলার চোখ মুখ খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। সুশোভনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো, বাঁচালে সুশোভন। আমি দুদিন আগেও ভাবতে পারিনি, আমার একমাত্র সাধ এমনি করে পূর্ণ হবে।

গভীর স্বরে সুশোভন বললো, সব সময় তোমার সব সাধ

আমি আমার সাধ্য মতো পূর্ণ করবার চেষ্টা করবো গিজলা।

আমার সৌভাগ্য তোমার সংগে আমার আলাপ হয়েছে, একটু থেমে গিজলা বললো, তোমার সব কথা হয়তো অনেক সময় আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারি যে আমি আবার নতুন করে বেঁচে উঠছি।

সত্যি যদি তোমার সেকথা মনে হয় গিজলা তাহলে আমি বলবো আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, গিজলার ভাষা উল্লেখ করে সুশোভন বললো, আমি নতুন করে বেঁচে উঠেছি—একথা মানুষ যখনই ভাবতে পারে তখনই বুঝতে হবে গভীর আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে গেছে। তখন কোনো আঘাতেই সে আর ভেঙে পড়ে না। হাজার বাধার মধ্যে দিয়ে পথ করে সে ঠিক সামনে এগিয়ে যায়।

এতো কথা তো আমি বুঝুতে পারি না সুশোভন।

সুশোভন হেসে বললো, আমিও বুঝতে পারিনি এতোদিন। কিন্তু তোমাকে যতোই দেখছি ততোই অনেক অজানা অস্পষ্ট কথা আমার কাছে নতুন হয়ে উঠছে।

গিজলা কথা না বলে সুশোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো। আজ অনেক দিন পর সেই নির্জন অরণ্যে সুশোভনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গভীর বেদনায় তার মন ভরে গেল। তার মনে হলো, কার্লের মতো, টমাসের মতো এও হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে ছেড়ে কোথাও চলে যাবে, যখন তার সংগে দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এতো কম বয়সেও একথা গিজলা বুঝতে পেরেছে যে বেশিদিন কিছুই থাকে না—অন্তত তার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে

নেবার জন্যে কে যেন এক কঠিন জাল রচনা করে রেখেছে। হঠাৎ একদিন সেই জাল সে টেনে নেয়। আর গভীর অন্ধকারে দিশা-হারা হয়ে গিজলা ঘুরে মরে।

কী ভাবছো গিজলা?

জানি না, চোখের জল গোপন করে গিজলা বললো, আনন্দ বহন করবার ক্ষমতা বোধ হয় আমি হারিয়ে ফেলেছি সুশোভন, তাই মনে আনন্দ হলেই আমার চোখে জল জমে ওঠে। মনে হয়, সুখ আনন্দ এসব আমার জন্যে নয়।

কে বলে সে কথা? এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের আনন্দ ভোগ করবার সমান অধিকার। যারা তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চায় তারা মানুষের শত্রু—

সুশোভনকে বাধা দিয়ে গিজলা বললো, আজ নিজের দিকে তাকিয়ে আমার সেকথা মনে হয়। শুধু আমার একার নয়, আমার দেশের অসংখ্য লোক আজ এই অবস্থায় এসে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমি জানি গিজলা।

হিটলারের অভিসন্ধি আমরা প্রথমে বুঝতে পারি নি। বোঝ-বার মতো বয়সও ছিলো না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গিজলা বলে চললো, কিন্তু দেশে চারপাশে ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে আজ বুঝতে পারি ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ হয়ে মাত্র একজন মানুষ সমস্ত জাতির সর্বনাশ কী ভাবে করতে পারে—গিজলার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

সুশোভন বললো, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবনা করে এখন লাভ নেই। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ এ রকম না করতে পারে আমাদের প্রত্যেককে এই কথা মনে করে এই মুহূর্ত থেকে সতর্ক হতে হবে।

গিজলা সুশোভনের কথার কোনো উত্তর দিলো না। ছলো-ছলো চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে সুশোভনের মাথা কোল থেকে নামিয়ে খাবারের প্যাকেট খুলে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে লাগলো।

তারপর সুশোভনের সংগে আমার আর দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে তাকে দু একদিন ক্লাশে দেখেছি বটে কিন্তু কথা বলবার সুযোগ পাবার আগেই সে হঠাৎ কখন উধাও হয়ে যায়। তাকে দেখেই বুঝতে পারি সব বিষয়ে তার শৈথিল্য এসেছে, কোনো কিছুই আর যেন সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায় না। ক্লাশে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকে বটে কিন্তু বুঝতে পারি তার কথায় সুশোভনের একেবারে মন নেই। শূন্য চোখে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে কী কথা সে যেন ভাবে।

কী ভাবে অবশ্য সেকথা বুঝতে আমার দেরি হয় না। কিন্তু আমি যতো ভাবি ততো অবাক হই। কেন সে এমন করে সব ভুলে যায়, সব কিছু বিসর্জন দিতে চায়! ধরে নিলাম গিজলা সারা মন জুড়ে বসে আছে কিন্তু তা বলে এমনি করে সে নিজের কর্তব্য ভুলবে কেন। কতো মানুষ তো প্রতিদিন ভালোবাসে, আর আমি যতোদূর জানি কর্তব্যপরায়ণ যে সে ভালোবাসলে আরও বেশি কাজের লোক হয়ে ওঠে। সুশোভনের মতো সব কিছু ভুলে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে না।

সেদিন আবার সুশোভনকে ক্লাশে দেখলাম কিন্তু যথারীতি কথা বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না। আমি ঠিক করলাম সুশোভনের কল্যাণ কামনায় আমার অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। এমন চুপ করে বসে থেকে আশা ছেড়ে দেয়া ভালো

দেখায় না। কী জানি দেশে ফিরে গেলে হয় তো তার বাড়ির লোক আমাকেই দোষ দেবে। বলবে, এক দেশে থেকে অন্তরংগ বন্ধু হয়ে কেন আমি তাকে সর্বনাশের পথ থেকে রক্ষা করলাম না।

ভাবলাম, আর দেরি নয়, সব খবর দিয়ে বেশ গুছিয়ে সুশোভনের বৌদিকে একটা বড়ো চিঠি লিখতে হবে। আমাকে অগ্রাহ্য করলেও তার বৌদির কথা সহসা সে উড়িয়ে দিতে পারবে না। দেশেও যে তার অধঃপতনের খবর পৌঁছেছে সে কথা জেনে নিশ্চয়ই সুশোভন লজ্জা পাবে।

আমি নিজে এখানে যাই করি না কেন তাতে কারোর কিছু এসে যাবে না—আমার নিজেরও নয়। কেননা আমি এক মুহূর্তের জন্যে ভুলি না আমি কেন এদেশে এসেছি। সুশোভন তার নিজের কাজ ভুলবে কেন। আমি তার বৌদিকে জানি এবং একথাও জানি সুশোভন একমাত্র তাঁর সংগেই মনের কথা বলে। তবু তাঁকে চিঠি লেখবার আগে ঠিক করলাম আর একবার সুশোভনের সংগে আমায় দেখা করতে হবে। তার সংগে কতো-গুলো কথা স্পষ্ট আলোচনা করে জানতে হবে এতোদিনে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়েছে। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে রক্ষা করবার আমি শেষ চেষ্টা করবো।

একথা ভাববার কয়েকদিন পরই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে রাস্তায় সুশোভনের সংগে আমার দেখা হয়ে গেল। তখন অনেক রাত। এগারোটা বেজে গেছে। কিন্তু লণ্ডনে গ্রীষ্মের রাত গভীর হলেও চারপাশ নিঃঝুম হয় না। অনেক পথিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় আর পায়ের শব্দে মনে হয় সবে সন্ধ্যা হয়েছে।

হানাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে টিউব স্টেশনের

দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই রাত্রে সুশোভন একটা ছোটো রেস্তোরাঁ থেকে বেরোলো।

তাকে অতো রাত্তিরে হঠাৎ রাসেল স্কোয়ারের একটা ছোটো রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার? তুমি এখানে এতো রাত্তিরে?

আমাকে দেখে সহজ হাসি হেসে সুশোভন বললো, কেন? তুমি আসতে পারো আর আমি পারি না?

আমাদের কথা আলাদা, আমরা কখন কী করি, কোথায় থাকি ঠিক নেই—

আমারও ওই এক অবস্থা, পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুশোভন বললো, এ দোকান ছাড়া এতো রাত্তিরে আর কোথাও সিগ্রেট পাওয়া যায় না। তাই এদিকে এসেছিলাম—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবে থেকে সিগ্রেট ধরলে?

এই কিছুদিন থেকে।

আমি সুশোভনের পা থেকে মাথা অবধি একবার তাকিয়ে নিয়ে বললাম, সত্যি, সুশোভন, তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

যাক, সিগ্রেট ধরিয়ে সুশোভন বললো, তোমার চোখে তা পড়েছে জেনে খুশি হলাম। তবে আমার মনে হয়, আমার শুধু পরিবর্তন হয় নি, আমি যেন নতুন করে জন্মেছি। আমার পুরানো মতামত, আমার আগেকার সমস্ত কিছু আমি একেবারে ভেঙে চুরে দিয়েছি।

আমার মন তখন খুব ভালো ছিলো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না হানার সংগে নতুন কোনো লোকের আলাপ হয়েছে কিনা। কেননা আজকাল আমাকে কথা দিয়ে প্রায়ই সে কথা

রাখে না। আমি জানি কারোর ওপর ওদের আকর্ষণ শিথিল হলে তাকে ওরা এমনি করেই এড়িয়ে চলে। তখন হাজার সাধাসাধি করেও আর লাভ নেই। ছেড়ে যাবার ইচ্ছে হলে কিছুতেই ওদের ফেরানো যায় না। আমি অবশ্য কখনও সে চেষ্টাও করি না, আমি চেষ্টা করি অন্য কাউকে সন্ধান করে নিতে। তাই আজ আবার ক্লাবে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতো কথা সুশোভনের সংগে আলোচনা করা যায় না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট টানতে লাগলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুশোভন আবার কথা বললো, কী চুপ করে আছো যে? আমার কথা শুনতে তোমার বুঝি ভালো লাগছে না?

আমি হেসে বললাম, না। বরং তোমার মতো লোকের মুখ থেকে এসব কথা শুনতে আমার খারাপ লাগছে।

কেন বল তো?

তা ঠিক বলতে পারবো না, একটু থেমে বললাম, আমি জানি এসব কথা তুমি কেন বলছো, তাই শুনতে আমার ভালো লাগছে না। কারণ যাকে উপলক্ষ্য করে তুমি এসব কথা বলছো, তাকে আমি তোমার মতো মন নিয়ে কোনোদিনও বিচার করতে পারবো না।

সে কথা তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারি! দুজনের দৃষ্টি-ভংগি এক হবার তো কথা নয়।

সব বুঝলাম। ধরো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোনো কৌতূহল কিংবা কোনো আপত্তি নেই। আমি শুধু বন্ধু হিসেবে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই—

সুশোভন উৎসাহ দেখিয়ে বললো, বল?

আমি বললাম, তোমার জীবনে যাই আসুক না কেন তুমি এমন করে সব কাজ ভুলবে কেন?

সুশোভন হাসলো, কাজ ভোলাবার মতো জিনিশ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে, আজ আমার জীবনে যদি তা এসে থাকে তাহলে তা কি আমার সৌভাগ্য নয়? কাজ তো আমি ইচ্ছে করে ভুলছি না, কে যেন আমাকে আমার প্রতিদিনের সব কিছুই ভুলিয়ে দিচ্ছে।

তোমার যে এমন অবস্থা হবে আমি তা কখনও ভাবতে পারি নি—

বাধা দিয়ে সুশোভন বললো, আমিও পাবি নি। তাই বলছিলাম, আমি যেন নতুন করে জন্মেছি। এতোদিন মিথ্যের প্রাচীরে আম নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলাম। তাই জীবনের স্বাদ আমি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পাবি নি। আজ সে-প্রাচীর চুরমার হয়ে গেছে বলেই আমি সব কিছু তুচ্ছ করতে পেরেছি।

তুচ্ছ করবার কথা বলছো কেন? আমি বলবো তুমি ভুল করছো। আর ভুলের জন্যে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। আজ নিজের যে ক্ষতি তুমি করে চলেছো তখন তা পূর্ণ করবার কোনো উপায় থাকবে না।

সুশোভন হেসে বললো, কিছু মনে করো না। তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। পরে যা-ই হোক না কেন, আমাকে কোনোদিনও অনুতাপ করতে হবে না। আমি যে অল্পক্ষণের জন্যে জেগে উঠেছিলাম, অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম—সেই স্মৃতি আমাকে চিরদিন উজ্জ্বল করে রাখবে।

আমি বললাম, দেখা যাক।

সুশোভন বললো, হিসেব-নিকেশ লাভ-ক্ষতি, এ ব্যাপারে এসব কথা কখনও আমার মাথায় আসে না। কারণ আমি যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, একটু চুপ করে থেকে সুশোভন বললো, নিজের কথা ভাবতে ভাবতে আমিও আজকাল অবাক হয়ে যাই, আমার নিজের মধ্যে যে এতো আনন্দ লুকিয়ে আছে সেকথা তো আমি আগে কখনও বুঝতে পারি নি। সে-আনন্দের স্বাদ পেয়েছি বলে আমি সব কিছু তুচ্ছ করতে পারি।

আমি সহজ ভাষায় বললাম, ভালো অনেকেই বাসে, তোমার মতো এমন আনন্দের স্বাদ অন্য অনেকেই পায়, কিন্তু তারা সব কাজ ভুলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে না—

সুশোভন বললো, তারা ভালোবাসে কিন্তু মেতে ওঠে না, তারা প্রেমের স্বাদ পায় না বলে যৌবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। আমি যে আজ অকস্মাৎ নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছি, এ আনন্দ আমার একার। তোমাকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে একথা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না।

তুমি বোঝালেও আমি বুঝতে চাইবো না। সেকথা যাক। কিন্তু তুমি কি জানো যে গিজলা তোমাকে ভালোবাসে?

জানি না।

তাহলে?

সুশোভন বললো, বললাম তো দেনা পাওনার হিসেব করবার ইচ্ছে বা অবসর আমার নেই। তবে ওর মনের নাগাল পাবার জন্যে আমার অজ্ঞাতে হয়তো আমি অনেক কিছু করে থাকি— যা আগে করবার কথা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম না—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যেমন?

ধরো নিজের পড়াশুনোর বাইরে ওর সংগে নানা আলোচনা

করি, ওর ব্যালের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা শুনি, ওর ব্যক্তিগত নানা ব্যাপারে আমি আন্তরিক কৌতূহল প্রকাশ করি। আমি কী, কিংবা ও কে এসব কথা আমার তখন মনে থাকে না। শুধু ভাবি আমার সব কিছু ভুলে, সব দম্ভ বিসর্জন দিয়ে কেমন করে ওর সংগে একেবারে এক হয়ে যাবো।

তোমার যা খুশি তা করবার নিশ্চয়ই তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে আমরা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি। তাই তোমার মতো ছেলে যখন পড়াশুনোয় শৈথিল্য দেখায় তখন দুঃখ হয় আর এমন করে যে তোমার ক্ষতি করছে তার ওপর রাগে শরীর-মন জ্বলে যায়—

আমার নাম ধরে সুশোভন বললো, ভুল কথা বলো না। এসব কথা শুনতে আর আমার ভালো লাগে না। অনেক পড়েছি, অনেক কাজ করেছি, অনেক সঞ্চয় করেছি, এখন সব কিছুর সামান্য অপচয় করলে কোনো ক্ষতি নেই বরং লাভ, হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন বললো, জানোই তো বার্ধক্যের ধর্ম সঞ্চয় আর যৌবনের ধর্ম অপচয়। আমাদের জীবনে বার্ধক্য প্রধান তাই অপচয়ের আনন্দের স্বাদ পেতে আমাদের বহু দেরি হয়। অনেকে তাও পায় না।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুশোভন আবার বলে চললো, হয়তো তোমার ভাষায় আমি কাজ ভুলতে পারছি আর সময় নষ্ট করছি বলেই গিজলা আমাকে ভালোবাসতে পারছে। মেয়েরা কর্তব্যপরায়ণ লোককে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করে বটে কিন্তু একটু ভেবে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে তারা সব সময় ভালোবাসে অকর্মণ্য বেহিসেবি পুরুষকে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গ্রীষ্মের আকাশের দিকে

তাকিয়ে সুশোভন বললো, আমি আজ মনে প্রাণে অকর্মণ্য হতে পেরেছি বলেই গিজলা সব আনন্দ ফেলে আমার সংগে দেখা করবার জন্যে ছুটে আসে। আর আমিও শুধু প্রহর গুনি কখন ও আসবে—

কিন্তু সুশোভনের এসব কথা আমার কানে গেল না। ভাবলাম সহজে এর শেষ হবে না। এর মধ্যেই ব্যাপার বেশ অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ঠিক করলাম, আর দেরি করবো না, কালই তার বৌদিকে সব ব্যাপার বেশ গুছিয়ে বলে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখবো। ফল হয়তো কিছুই হবে না। কিন্তু আমি যখন এখানে আছি তখন একবার শেষ চেষ্টা করতে ক্ষতি কী!

মিসেস কোহেনের মেজাজ আজকাল আর সহ্য করা যায় না। কী যে হয়েছে তার কদিন থেকে দিন রাত কারণে অকারণে গিজলা আর এলফ্রিডাকে শুধু কঠিন কথা বলে। একদিন এলফ্রিডার সংগে তার তুমুল তর্ক হয়ে গেল। দুদিন আগে হলে হয়তো সে মিসেস কোহেনের সংগে এমন করে ঝগড়া করতে পারতো না, কিন্তু ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতালের কাজটা সে এর মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে আর নানা বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছে যে দেশ থেকে ভাড়া দিয়ে নিয়ে এলেও এমন অত্যাচার করে জোর করে তাকে আটকে রাখবার কোনো অধিকার মিসেস কোহেনের নেই। আর ইচ্ছে করলে এলফ্রিডা জেরাডস্‌ক্রশের থানায় গিয়ে পুলিশের সাহায্য নিতে পারে।

এলফ্রিডার মুখ থেকে এমন অস্বাভাবিক কঠিন কথা শুনে রাগে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো মিসেস কোহেনের। সে কর্কশ স্বরে শুধু বললো, এখুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আর

গিজলা, তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে মিসেস কোহেন বললো, তোমাকেও আমি আর রাখবো না। ইচ্ছে করলে তুমিও ওর সংগে চলে যেতে পারো। আর যদি এখন যেতে না চাও তাহলে সাতদিন তোমাকে সময় দিলাম। তার মধ্যে অন্য কোনো কাজ দেখে যেখানে খুশি তুমি চলে যেও। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। জার্মান মেয়ে আর কোনোদিন এ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না—রাগে গজগজ করতে করতে মিসেস কোহেন অন্য ঘরে গিয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলো।

মিসেস কোহেনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে এলফ্রিডাকে গিজলা বললো, আমার কী হবে ?

একটু ভেবে এলফ্রিডা বললো, মাস খানেকের আগে হাস-পাতালে তোমার কাজ আমি করে দিতে পারবো না। কাল ওদের সংগে আমি তোমার সম্পর্কে কথা বলেছিলাম—

কিন্তু শুনলে তো আমাকে সাতদিনের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ? কোথায় যাবো আমি ?

তোমার ভাবনা কী ? রসিকতা করে এলফ্রিডা বললো, অমন বন্ধু রয়েছে তোমার—

কিন্তু সে এ ব্যাপারে কী করবে ?

তোমার বিপদের কথা শুনে সে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। একটা উপায় করে দেবে, এলফ্রিডা হেসে বললো, সে যে তোমার কতো বড়ো বন্ধু তার পরীক্ষা নেয়ার এই তো সুযোগ। এবার তাকে ভালো করে যাচাই করে নাও।

কিন্তু তুমি চলে যাবে মনে করে আমার ভয় লাগছে এলফ্রিডা—

দূর বোকা! ভয় কী ?

মিসেস কোহেন যদি আমার সংগে আরও খারাপ ব্যবহার করে?

আর কী করবে? বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের সাহায্য নেবে, গিজলার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলফ্রিডা বললো, কতো বড়ো বিপদ জার্মানীতে কাটিয়ে এলে আর এখানে এই সামান্য ব্যাপারে এতো বিচলিত হচ্ছো কেন?

জানিনা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গিজলা বললো, অনেকদিন পর সুশোভনের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে মনটা এখন হঠাৎ একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। তাই কারোর কাছ থেকে সামান্য অনাদর আর সইতে পারি না।

খুব জোরে হেসে এলফ্রিডা বললো, তুমি একেবারে মরেছো। এখনও সতর্ক হও। নাহলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হবে।

সেই দিন জেরাডস্‌ক্রশের বাড়িতে গিজলাকে একা রেখে এলফ্রিডা ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতালে নার্সের কাজ নিয়ে চলে গেল। গিজলার ওপর তার যতোই ঈর্ষা থাক না কেন, সে চলে যেতে গিজলার নিজেকে অসহায় মনে হলো। তবু যতো-ক্ষণ বাড়িতে থাকতো সে তার সংগে নিজের ভাষায় মনের কথা বলতে পারতো। এখন তার আর কোনো উপায় রইলো না। সুশোভনকে ছাড়া এখানে সে আর কাউকে চেনে না। এলফ্রিডা চলে যেতে আজ প্রথম তার মনে হলো আরও অনেকের সংগে তার আলাপ থাকলে যেন ভালো হতো, তাহলে হয়তো তাদের কারোর সংগে সে তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারতো। যাহোক অবশেষে গিজলা ভাবলো, তার মনকে এমন কোমল করে রাখলে চলবে না। সুশোভনের সংগে মিশে সে যেন রীতি মতো ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ঠিক কথা বলে গেছে

এলফ্রিডা, এখনও সতর্ক হও। নাহলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হবে।

বাগানে বাচ্চা খেলা করছে। আজ তার সংগে ছুটোছুটি করতে একটুও ইচ্ছে করছে না গিজলার। ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে নিজের কথাই ভাবছিলো। এমন করে সে আর দিন কাটাতে পারছে না। সাতদিন পর মিসেস কোহেন তাকে তাড়িয়ে দিলে সে কোথায় যাবে জানে না। কেন তার জীবন এমন অনিশ্চিত হয়ে উঠলো? কোনো আশ্রয় নেই তার। দেশে নিজের বাড়িতে থাকতে পারলো না বলে এখানে চলে এলো। এখন তাকে কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে কে জানে।

কার্লের কথা মনে পড়লো। তার জীবনের প্রথম মানুষ। যদি তখন ফ্রেডারিকা অমন করে তার মন বিষিয়ে না দিতো তাহলে হয়তো তাকেই সে বিয়ে করতো। আর যথাসময় দুজন একসংগে শেষ হয়ে যেতো। টমাসকেও সে ধরে রাখতে পারলো না। কিছুই সে ধরে রাখতে পারে না। তাই সুশোভনের কথা ভাবলে অনেক সময় তার ভয় হয়। নিজের ওপর রাগও হয়। কেন সে তার ওপর নির্ভর করতে চায়। সে তো মনে মনে নিশ্চিত জানে দুদিন পরে এসব কোথায় মিলিয়ে যাবে। ঠিক কথা বলে গেছে এলফ্রিডা, তাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে এই মুহূর্ত থেকে সতর্ক হতে হবে। কারোর ওপর চিরকাল নির্ভর করবার স্বপ্ন দেখে সে আর কখনও ঠকে যাবে না।

কতোক্ষণ গিজলা সেই ঘাসের ওপর শুয়েছিলো জানে না, হঠাৎ সে দরজা খোলবার শব্দ পেলো। মিসেস কোহেন ফিরেছে মনে করে তাড়াতাড়ি উঠে বসে গিজলা বাচ্চাকে কাছে ডেকে নিলো।

না মিসেস কোহেন নয়, গিজলা দেখতে পেলো মিস্টার কোহেন হাসি মুখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। যাক বাঁচা গেল। স্ত্রীর চেয়ে স্বামীকে অনেক বেশি ভালো লাগে তার। আর মিস্টার কোহেন স্ত্রীকে এড়িয়ে সুযোগ পেলেই তার সংগে ভালো ভাবে কথা বলে—ভালো ব্যবহার করে। তাই স্ত্রীর বদলে এ সময় স্বামীকে বাড়ি ফিরতে দেখে গিজলা খুশি হলো।

গুড ইভনিং গিজলা, তার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ে মিস্টার কোহেন বললো, তোমার বন্ধু চলে গেল বলে তোমার খুব একা একা লাগছে, না?

গিজলা ম্লান মুখে বললো, একটু খারাপ লাগছে বৈকি।

দু এক মিনিট চুপ করে রইলো মিস্টার কোহেন। তারপর গিজলার আর একটু কাছে সরে এসে বললো, আমার স্ত্রীর যা মেজাজ! দেখতেই তো পাও আমার সংগে কেমন খিট খিট করে। তাই ওর কথা শুনে তুমি কিছু মনে করো না যেন—

গিজলা বললো, আমাকেও তো সাতদিন পর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা বলেছে।

না না, তুমি কোথায় যাবে। আমি কবে থেকে ভাবছি তোমার সংগে ভালো করে আলাপ করবো। এলফ্রিডার চেয়ে তুমি অনেক ভালো দেখতে, মিস্টার কোহেন অসঙ্কোচে গিজলার একটা হাত নিজের কোলের ওপর তুলে নিলো।

কিন্তু ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়ে গিজলা বললো, আপনি আমার সংগে এতো ঘনিষ্ঠতা করছেন দেখলে মিসেস কোহেন রেগে যাবে। ওর তো আসবার সময় হলো—

না, মিস্টার কোহেন হেসে বললো, তার এখন ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। দোকানে কী মিটিং আছে, তারপর

সেখানেই ওরা খাওয়া দাওয়া করবে। আমাকে আপিসে ফোন করে জানিয়েছে বাড়ি ফিরতে রাত হবে।

গিজলাও হাসলো, তবে তো ভালোই হলো।

হ্যাঁ, তোমার সংগে এই সুযোগে ভালো করে আলাপ করে নেয়া যাবে। দেখছো কী সুন্দর দিন আজ, গিজলার পাশে শুয়ে পড়ে মিস্টার কোহেন বললো, কতোদিন তোমাকে নিয়ে বাইরে যাবো ভেবেছি কিন্তু সুযোগ হয় নি বলে এতোদিন সে কথা বলতে পারি নি—

তার কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে গিজলা বললো, আমারও বাইরে যাবার ইচ্ছে অনেক দিনের। ইউরোপের সব দেশ ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে—

দেখি আমি যদি পারি তাহলে ভবিষ্যতে তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।

গিজলা আর কোনো কথা তখন বললো না। বাচ্চাকে খাওয়াবার সময় হয়েছে বলে তাকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলো।

রান্নাঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে সে দেখলো মিস্টার কোহেন তখনও বাগানে শুয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগলো গিজলার আজ। এ বাড়িতে এই প্রথম তার মুখ থেকে সে ভালো কথা শুনলো। এলফ্রিডা চলে গেছে বলে এখন তার আর দুঃখ হলো না, বরং তার মনে হলো, হয়তো সে চলে গেছে বলে মিস্টার কোহেন তার কাছে এতো সহজ হতে পারলো। কেননা স্পষ্ট করে এলফ্রিডা তার কাছে কিছু না ভাঙলেও সে জানতো মিসেস কোহেনের অলক্ষ্যে এ বাড়ির কর্তার সংগে তার একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর

তাই এলফ্রিডার কাছে সব সময় বেশি টাকা থাকতো। মনে মনে হাসলো গিজলা। ভালোই হয়েছে সে চলে গেছে। এবার গিজলার পালা। সেও যখন যা কিছু পাবে মিস্টার কোহেনের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। বিদেশে যদি এমন বড়োলোকের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তার উপকার হবে। না পেয়ে পেয়ে গিজলার মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে সামান্য পাবার সম্ভাবনা থাকলে অধৈর্য হয়ে সে যতোটুকু পারে আদায় করে নিতে চায়। কারণ সে জানে খুব তাড়াতাড়ি সময় ফুরিয়ে যাবে। আবার শূন্যে মিলিয়ে যাবে সব কিছু। তাই সময় থাকতে সে যেটুকু পায় পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করে নিতে চায় সব কিছু।

খুব বেশি অবাক হয়ে গেছে সুশোভন। সে বারবার পড়লো চিঠিটা! তার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে অবশেষে বৌদি লিখেছেন, আমরা জানি তুমি কখনও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারো না। এবং এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কাজের কথা বিস্মৃত হও না। তাই তোমার সম্বন্ধে নিন্দে করে লোকে যখন কিছু লেখে তখন সত্যি আমরা অবাক হয়ে যাই। ভাবি, লোকে তোমার মতো লোকের দুর্নাম দেয় কেমন করে। পরের কথায় বিশ্বাস করে হয়তো এতো কথা তোমাকে লিখতাম না কিন্তু আমার নিজের দু একটি কথা মনে হচ্ছে বলে এ চিঠি তোমাকে লিখছি।

তুমি বিলেত যাবার আগে কথায় কথায় তোমাকে একদিন বলেছিলাম, আবার ফিরে আসবে তো? আশা করি সেকথা তোমার মনে আছে। তুমি অবশ্য সেকথায় তখন কোনো গুরুত্ব দাওনি। বলেছিলে, এখানে যেমন আছো ওখানে গিয়েও ঠিক তেমনি থাকবে। এবং তোমার কোনো পরিবর্তন হবে না। আমার

বয়স ও সংসারিক অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে অনেক বেশি বলে তখন তোমার সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। মুখে তুমি যা-ই বল না কেন, আমি জানতাম নতুন দেশে নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের মাঝে পড়ে তোমার পরিবর্তন হবেই। সব মানুষের বেলায় একথা খাটে। তুমিও মানুষ তাই তোমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না।

যা হোক, ভাই ঠাকুরপো, ওদেশে গিয়ে তোমার জীবনে সত্যি যদি পরিবর্তন এসে থাকে আর তুমি যদি বন্ধনের স্বাদ পেয়ে থাকো তাহলে অসঙ্কোচে অবিলম্বে সেকথা আমাকে জানাও। আশা করি একথা না বললেও চলতো যে তোমার এ সংবাদে আমিই সব চেয়ে বেশি খুশি হবো। আমি জানি তুমি কখনও আমার কাছে কিছু গোপন করবে না। শুধু আমার কাছে কেন, প্রত্যেকের কাছে সত্য স্বীকার করবার সাহস তোমার আছে সেকথা আমার অজানা নেই। তাই তোমার নিজের কাছ থেকে সব কথা জানতে পারলে আমার সংশয় দূর হবে। আমি বুঝতে পারবো আসল ব্যাপার কী। এসব কথা তোমাকে স্পষ্ট লিখছি বলে তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করবে না। এ চিঠি পেয়েই উত্তর দেবে।

তোমার খবর শুনে বাবার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। তিনি লণ্ডনের এক বন্ধুর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে তুমি নাকি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নানা বাজে মেয়ের পেছনে টাকা উড়িয়ে সময় নষ্ট করছো। বলা বাহুল্য একথা তিনি বিশ্বাস করেছেন আর ভাবনায় ভাবনায় অশান্তিতে তাঁর দিন কাটছে। আমাকে দেখলেই তিনি বলেন, কেন ওকে এতো টাকা নষ্ট করে অধঃপতনের পথে ঠেলে দিলাম? বিলেতে গেলে সব ভালো ছেলেরা নাকি এমনি করে খারাপ হয়ে যায়। কেউ কেউ

তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন তোমাকে আর টাকা না পাঠাতে। তাঁদের বিশ্বাস টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেই নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।

হয়তো এতো বাজে কথা এমন করে তোমাকে লেখবার কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এসব শুনতে আমার খারাপ লাগে বলেই তোমাকে এখানকার সব খবর জানালাম। তুমি সব খবর দিয়ে আমার চিন্তা দূর করো। আশা করি ভালো আছো। শরীরের খবর জানাতে ভুলো না। আজ শেষ করি। আমাদের খবর মোটামুটি ভালো।

ইতি
তোমার
বৌদি

চিঠি পড়ে প্রথমে অবাক হলেও নানা কথা ভেবে পরে যেন সুশোভন খুশি হলো। যাক বৌদির কাছেও তাহলে আর কিছুই গোপন নেই। অনেক বার বৌদিকে চিঠি লিখতে গিয়ে সে ইতস্তত করেছে। কিছুতেই তাঁর কাছে নিজের দম্ভ একেবারে বিসর্জন দিতে পারেনি। আজ বাইরে থেকে তাঁর কানে সব কথা পৌঁছেছে জেনে সে নিশ্চিন্ত হলো। ভাবলো এবার তাঁকে সব কথা স্পষ্ট করে লিখতে আর তার কোনো দ্বিধা হবে না। সব দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেছে তার।

অন্যায় করেছে বৈকি সুশোভন। এতোদিন নিঃশব্দে বাবার টাকা নেয়া তার কোনো মতেই উচিত হয় নি। তাঁর কাছ থেকে আর সে টাকা নেবে না। তিনি যে কাজের জন্যে তাকে টাকা পাঠাচ্ছেন সে কাজ তো করছে না সুশোভন। কাজেই তাঁর কাছ থেকে মাসে মাসে ফাঁকি দিয়ে মোটা টাকা নেয়া সব দিক থেকে

অন্যায়। বৌদিকে সে লিখবে কিছুতেই যেন তাকে আর টাকা পাঠানো না হয়।

এখানে আপাতত একটা কাজ ঠিক করে নিয়ে সে নিজের খরচ নিজে চালাতে চেষ্টা করবে। গিজলার মতো অমনি একটা কাজ পেলে এখন তার পক্ষে সব চেয়ে ভালো হয়। তাহলে হয়তো সে গিজলার অসুবিধার কথা আরও ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। কিন্তু তেমন কোনো কাজ সে কেমন করে পাবে এখানে। আর বসে থাকলে চলবে না। এখন থেকেই তাকে কাজের চেষ্টা করতে হবে। এতোটুকু বিচলিত হলো না সে। বরং সব তুচ্ছ করবার আনন্দে তার মন ভরে উঠলো। সুশোভন ঠিক করলো একটু ভেবে দুএক দিনের মধ্যে সব খবর দিয়ে বৌদিকে দীর্ঘ চিঠি লিখবে আর অবকাশ মতো গিজলাকে বলবে, এখন আর কোনো বাধা নেই। এবার তুমি প্রস্তুত হও। তোমার আমার অবস্থা এখন একেবারে এক। আমার কোনো দম্ভের জন্যে তুমি আর আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না, আমারও তোমাকে কাছে টেনে নিতে সংশয় হবে না। কারণ সব ব্যবধানের প্রাচীর হঠাৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।

সেদিকে কিন্তু ঠিক আছে মিসেস কোহেন। এলফ্রিডা চলে যাবার পর গিজলার ঘাড়ে তার কাজ চাপালো না। নিজেই স্বামীর সাহায্যে সব করে নিতে লাগলো। গিজলা তেমনি শুধু বাচ্চার দেখাশোনা করতে লাগলো।

হঠাৎ মিসেস কোহেন যেন একটু ভালো হয়ে গেছে। এলফ্রিডা যাবার পর সারাদিন খিট খিট করে না। গিজলার সংগে তার কথা বলবার ধরনও যেন বদলে গেছে। অবশ্য তার এ পরিবর্তনের

কারণ বোঝবার মতো বুদ্ধি গিজলার আজকাল হয়েছে। কিন্তু তাহলে সে বেঁচে যায়।

আসলে নতুন কাউকে বোধ হয় মিসেস কোহেন এখনও ঠিক করতে পারে নি। এদিকে গিজলাকে সাতদিনের মধ্যে চলে যেতে বলেছে। অথচ সত্যি যদি সে চলে যায় তাহলে বাচ্চাকে নিয়ে মিসেস কোহেনের রীতিমতো অসুবিধা হবে। দোকানে না গিয়ে বাচ্চার দেখাশোনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই বোধ হয় গিজলা এখন চলে না গেলে সে খুশি হয়। ভাষায় কিছু প্রকাশ না করলেও মিসেস কোহেনের মুখ দেখে গিজলা এ কথা বুঝতে পারে।

গিজলা এ বাড়ি ছেড়ে এখন আর চলে যেতে চায় না। এলফ্রিডা বলেছে হাসপাতালে তার চাকরি হতে প্রায় মাস খানেক লাগবে। কাজেই এখানে আর এক মাস থাকতে পারলে সব দিক থেকে ভালো হয়। অল্প কয়েক দিনের জন্যে নতুন বাড়িতে কাজ পাওয়া তার পক্ষে কঠিন। সে এখানে তেমন কাউকে চেনে না, দেশের আইন কানুনও ভালো করে জানে না। এখান থেকে বেরিয়ে তার যাবার কোনো জায়গা নেই। সুশোভনের ওখানে থাকা চলে না। তাতে অন্য বিপদ হবার সম্ভাবনা।

শুধু নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে নয়, বাচ্চাটার ওপরেও গিজলার এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশ মায়া পড়ে গেছে। ওর নাম পল। বছর পাঁচ-ছয় হবে ওর বয়স। মিসেস কোহেনের চেয়ে ও যেন আজকাল গিজলাকেই বেশি ভালোবাসে। এমন কি, রাত্তিরে উঠে মাঝে মাঝে গিজলার সংগে শোবার জন্যে বায়না ধরে। তাই মিসেস কোহেন যতো সহজে এলফ্রিডাকে বিদায় করতে পেরেছে ততো সহজে গিজলাকে ছাড়াতে পারবে বলে মনে

হয় না। অথচ গিজলার কাছে মুখ ফুটে একথা স্বীকার করতে বেধে যায় তার। গিজলা ভাবে, দেখা যাক কী হয়। সাতদিন পর সত্যি যদি মিসেস কোহেন তাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে সে পথে নেমে ভাববে কোথায় যাবে। এখন আজে বাজে ভাবনা ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই। এখনও নিজের সম্বন্ধে এসব ভাবনা তার মাথায় আসে বলে নিজেকে ব্যঙ্গ করে গিজলা মনে মনে হাসলো।

পলকে কাছে ডেকে আদর করতে করতে সে বললো,- জানো পল আমি এখান থেকে চলে যাবো—

আমিও যাবো তোমার সংগে।

তুমি কোথায় যাবে? তোমার মা যেতে দেবে কেন?

আমি পালিয়ে যাবো, মা টের পাবে না। রাত্তিরে উঠে তোমার সংগে চুপ করে চলে যাবো—

কিন্তু আমার তো এমন বাড়ি নেই, বাগান নেই। তুমি কোথায় খেলা করবে?

খেলা করবো না। তোমার সংগে ঘুরতে ঘুরতে আমি অনেক দূরে বেড়াতে যাবো, একটু থেমে কী ভেবে পল গিজলার হাত জোরে নেড়ে দিয়ে বললো, আমরা অ্যামেরিকা চলে যাবো।

গিজলা হেসে বললো, ও বাবা সে যে অনেক দূর। অতো দূরে যাবে কেমন করে?

এখানে যেমন করে ওই পার্কে তোমার সংগে খেলা করতে যাই। তেমনি হেঁটে হেঁটে তোমার হাত ধরে আমি অ্যামেরিকা চলে যাবো—

মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না?

কিছু না, সংগে সংগে পল উত্তর দিলো, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালোবাসি না।

পলের কথা শুনে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিলো গিজলা। মাঝে মাঝে তার সংগে এমনি আবোল তাবোল বকতে মন্দ লাগে না। ছোটো একটি ছেলের সংগে পাল্লা দিয়ে আকাশ কুসুম রচনা করতে করতে সে যেন নিজের অনিশ্চিত জীবনের জটিলতার কথাও ভুলে যায়।

এলফ্রিডা চলে যাবার পর এ বাড়িতে আরও একটি আকর্ষণ বেড়েছে তার। তা হলো এ বাড়ির কর্তা স্বয়ং মিস্টার কোহেন। সে প্রায়ই আজকাল গিজলার সংগে নানা ছলে কথা বলে— তাকে এটা সেটা উপহার দেয়। এমন কি, তার সঙ্গ পাবার জন্যে সে যে ব্যাকুল সেকথাও নানা ছলে জানিয়ে দেয়।

এক মঙ্গলবারে সুশোভনের বাড়ি না গিয়ে গিজলা মিস্টার কোহেনের সংগে হ্যাম্পটন কোর্টে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেদিন তার সংগে অনেক কথা হয়। আর একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি করেছিলো মিস্টার কোহেন। গিজলা প্রথমে অবাক হলেও মনে মনে বেশ খুশি হয়। সে ভাবলো মিস্টার কোহেন ইচ্ছে করলে এ বাড়িতে হাসপাতালে চাকরি না হওয়া পর্যন্ত হয়তো সে থেকে যেতে পারে।

গিজলা সেদিন তাকে বলেছিলো, আমাকে তোমার স্ত্রী ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তুমি একটা ব্যবস্থা করতে পারো ?

সে ছুটি দেবার কে ? আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না—

কিন্তু সে যে আমাকে বলে দিয়েছে—

কিছু ভেবো না। আমি তাকে বলে সব ঠিক করে দেবো।

এখন আমার বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। তুমি চলে গেলে আমার বেশ অসুবিধা হবে—মিস্টার কোহেন ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে গিজলাকে কাছে টেনে নিলো।

গিজলার ওপর দিয়ে নানা ঝড় বয়ে না গেলে হয়তো সে মিস্টার কোহেনের মতো লোককে এতদূর অগ্রসর হবার সুযোগ দিতো না। কিন্তু আজ তাকে সব কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে সব জেনে শুনে মিস্টার কোহেনের মতো লোককে প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে। তা না দিলে এ বাড়িতে সে কিছুতেই চাকরি রাখতে পারবে না। গিজলা ভাবলো, যেমন করে হোক তাকে আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হবে। অলীক দম্ভ নিয়ে উপবাস করবার কোনো মানে নেই। সে মিস্টার কোহেনের আরও কাছে সরে এলো।

কিন্তু ইচ্ছে করে গিজলা সুশোভনের কাছে এ ব্যাপার ভাঙলো না। মার উপদেশের কথা মনে পড়লো তার। সে গিজলাকে প্রায় বলতো, তোমার একজন প্রেমিকের কথা কখনও অন্য আর একজনের কাছে ভেঙো না।

অবশ্য মিস্টার কোহেন তার প্রেমিক নয়। গিজলারও তার ওপর সামান্য দুর্বলতা নেই। সে জানে দুদিন পর কোহেনের বান্ধবী জুটে গেলে সে তার দিকে আর ফিরেও তাকাবে না। কাজেই সে যেমন এ বাড়িতে পয়সার জন্যে ঝিয়ের কাজ করছে তেমন যদি অন্য নানা সুবিধার জন্যে তার মনিবকে সামান্য আনন্দ দেয় তাহলে ক্ষতি নেই। সুশোভন একথা শুনলে অকারণে আঘাত পেতে পারে ভেবে গিজলা তার কাছে এ প্রসঙ্গ একেবারেই তুললো না।

দুএকদিন থেকে গিজলা লক্ষ্য করছে মিসেস কোহেন যেন

আরও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরও বেশি চেঁচামেচি হচ্ছে। দিনের বেলা শুকনো 'সুপ্রভাত' জানানো ছাড়া কেউ কারোর সংগে আর কোনো কথা বলে না। সে ঠিক বুঝতে পারে না শিগগিরই এদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে কিনা। সে যদি মিসেস কোহেনের সংগে ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা করবার অধিকার পেতো তাহলে তাকে ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতো এমন নিশ্চিত আশ্রয় ভেঙে বাইরে বেরিয়ে যাবার পরিণাম কী। যা খুশি করুক মিস্টার কোহেন, সে যেন কখনও এমন আশ্রয় ছেড়ে যাবার কল্পনা না করে।

স্বামীর সংগে মিসেস কোহেনের তার সম্পর্কে কোনো কথা হয়েছে কিনা গিজলা জানেনা কিন্তু সেদিন সকালে দোকানে যাবার আগে সে তাকে ডেকে বললো, তুমি কি কোথাও কাজ ঠিক করেছো?

গিজলা মাথা নেড়ে বললো, না।

তাহলে এখান থেকে কোথায় যাবে?

দুএক মিনিট ভেবে গিজলা বললো, জানি না। আমি এখানে কাউকে চিনি না—কেমন করে কাজ ঠিক করতে হয় তাও জানি না—

বাধা দিয়ে মিসেস কোহেন বললো, এদেশে কাজ পাওয়া খুব সোজা নয়। আর এ বাড়ির মতো কাজ তুমি কোথাও পাবে না। এখানে তোমাকে তো বিশেষ কিছুই করতে হয় না—

গিজলা বললো, জানি। আমি এখানে খুব সুখেই আছি। কিন্তু আপনার যদি আমাকে দরকার না থাকে তাহলে কী করবো বলুন?

মনে মনে তাকে অভিশাপ দিয়ে ভাবলাম, কী আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়ে! প্রেমের কথার পরই পেটের চিন্তা।

মুখে বললাম, দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম। চলো, আমার বাড়িতে যাবে আজ?

ইভা সভয়ে বললো, না না।

কেন?

ইভা হাসলো, আগে ভালো করে জানি তুমি কেমন লোক। এতো অল্প আলাপে তোমার বাড়ি যাবার সাহস আমার নেই।

আমি বললাম, কেন আমাকে তোমার ভয় কিসের?

তোমাদের দেশের কোনো লোকের সংগে আমি আগে কখনও মিশিনি—

কিন্তু তাতে কী হয়েছে? একটু আগে তো তুমি বললে আমাকে ভালোবাসো?

তবু আরও কিছুদিন তোমাকে ভালো করে জানতে চাই। তারপর তুমি যখনই বলবে তখনই তোমার বাড়িতে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাবো।

আমি বললাম, আজ গেলে আমি নিজে রান্না করে তোমাকে খাওয়াতাম—

না, ক্ষমা করো, ইভা মুচকি হেসে বললো, আজ যেতে পারবো না। তার চেয়ে চলো কোনো ভারতীয় রেস্তোরাঁয় যাই?

তাই চলো, ইভার হাত ধরে আমি পিকাডিলির টিউব ট্রেন ধরলাম।

নিজের ওপর আমার রাগ হলো হঠাৎ। ইভার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, ও বোকা নয়। ওর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আমার বেশ সময় লাগবে। কিন্তু সময় আমার বেশি নেই। পরীক্ষা শেষ হয়ে

গেছে। আমার দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো। তাই এখন নিজেকে জানাবার বেশি সুযোগ কাউকে দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুদিন আগে হলে ইভার মুখ থেকে অমন কথা শোনবার পর আমি তাকে সংগে সংগে বিদায় করে দিতাম। আজ ওকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। এদেশের সব কিছুর ওপর যাবার বেলায় আমার যেন বড়ো বেশি মায়া পড়ে গেছে। দেশে ফেরবার সংগে সংগে শেষ হয়ে যাবে এই যৌবন। সেখানে এমন করে খেলা করা চলবে না। হিসেব করে চলতে হবে প্রতি পদে। সেখানে সম্পর্ক গড়া যেমন সময় সাপেক্ষ ভাঙ্গা তেমনি কঠিন।

পিকাডিলিতে নেমে ইভাকে নিয়ে হন হন করে 'কোহিনুরে'র দিকে এগিয়ে চললাম। বেশ প্রসিদ্ধ ভারতীয় রেস্তোরাঁ। দিশি খাবার ইচ্ছে হলে আমি সব সময় এখানে আসি।

অবিশ্রাম তুষার ঝরছে। পথ নির্জন। মাঝে মাঝে শুধু গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় কিন্তু বেশ ভিড়। চেয়ার খালি নেই একটিও।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখে ম্যানেজার উঠে এসে বললো, একটু অপেক্ষা করুন। এখুনি জায়গা হয়ে যাবে স্যার!

আমি বললাম, ঠিক আছে আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ইভার সংগে গল্প করতে লাগলাম।

ভাবলাম এবার থেকে আর কাউকে অতো আগে দিশি খাওয়ার কথা তুলবো না। কারণ এতে খরচ অনেক বেশি। ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই যদি সম্পর্ক ভেঙে যায় তাহলে শুধু শুধু আমার পয়সা নষ্ট হবে।

ইভা কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস

আমার কোনো ধারণা নেই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে চেষ্টা করে কোনো পক্ষই কিছু পেতে পারে না। যা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তা যথাসময়ে দুজনেই উপলব্ধি করে। আমি শুধু আমার নিজের কথা তোমাকে জানালাম। অন্য পক্ষের বেলায় আমি বিশেষ জোর দিয়ে তার মনের কথা জানাতে পারবো না। আভাসে ইঙ্গিত আমি নিজে হয়তো কিছু কিছু বুঝতে পারি কিন্তু তার দিক থেকে তোমাকে জানাবাব মতো কোনো কথা আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যদি তেমন কিছু কোনোদিন বুঝতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবো।

আজ আর কিছু নেই। ইতি

সুশোভন

চিঠি ডাকে দিয়ে সুশোভন নিশ্চিন্ত হলো। নিজের কথা কাউকে সে বলতে চায় না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় শুধু। বৌদি প্রশ্ন করেছেন বলেই এতো কথা জানাতে হলো।

চিঠি ডাকে দিয়েই সুশোভনের আর একবার মনে হলো আর একদিনও নষ্ট করা যায় না। কাল থেকে তাকে কাজের চেষ্টা করতে হবে। ভদ্রলোকের পাশে বসে ভদ্র কাজ করতে চায় না সে, কোনো হোটেলে বাসন ধোয়ার কিংবা পরিবেশন করবার কাজ পেলে সে খুশি হয়। এখানে অনেক ছাত্র মাঝে মাঝে অমন কাজ নাকি করে থাকে। তেমন কাজ পাওয়া খুব কঠিন নয়। ইচ্ছে করেই সুশোভন এ ধরনের কাজ করতে চায়। নিজেকে সংশোধন করতে হলে তাকে তেমন কাজ করতে হবেই।

গিজলার কথা ভাবতে ভাবতে অনেক সময় সুশোভন লজ্জা পায়। সে বুঝতে পারে তার অনেক কথায় গিজলা আঘাত পায়। সুশোভন যে তাকে ইচ্ছে করে আঘাত দেয় তা নয় কিন্তু সতর্ক

হওয়া সত্বেও গিজলা অন্য পরিবেশে বাস করে বলে সুশোভন তার মনের অলিগলির সন্ধান পায় না। এই পরিবেশের প্রাচীর সে ভেঙে দিতে চায়। সে যদি আজ কোনো রেস্তোরাঁয় কাজ পায় তাহলে হয় তো গিজলাকে আরও নিবিড় ভাবে বুঝতে পারবে, তার বখশিস পাওয়া নিয়ে কোনো কথা মাথায় আসবে না। অর্থ উপার্জনের জন্যে যখন হোটেলে সামান্য কাজ করতে হবে তখন তার পাণ্ডিত্যের মূল্য কেউ দেবে না কিন্তু হয়তো তার কাজে খুশি হয়ে অনেকে বখশিস দিয়ে যাবে আর সেই মুহূর্ত থেকে গিজলার সংগে তার পরিচয় নিবিড় হবে—আরও গভীর হবে।

সুশোভন ভাবলো, ভালোই হলো। বৌদি তাকে চিঠি না লিখলে গিজলার সংগে আরও কতোদিন সে নিজের অজ্ঞাতে দূর রচনা করে রাখতো কে জানে। চাকরি পেয়েই সুশোভন অন্য কোনো পাড়ার সস্তা ঘরে উঠে যাবে। সম্প্রতি বাড়ি থেকে তার টাকা এসেছে তাই মাসখানেক খরচের ভাবনা না ভেবে সকল রকমে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবে। আর গিজলার সংগে দেখা হলে এইসব কথা সে তাকে প্রথমেই জানিয়ে দেবে। তাদের দুজনের আর কোনো অমিল থাকবে না শুনলে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

আর কিছুদিন পর এতো আলো থাকবে না। ফুলগুলি শুকিয়ে ঝরে যাবে একে একে। গাছের পাতা থাকবে না একটিও। তুষারের কঠিন আঘাতে সব সৌন্দর্য হারাবে প্রকৃতি। বাগানে তখন আর চেয়ার বের করা চলবে না, সাঁতার কাটাও বন্ধ হয়ে যাবে গিজলার। তখন তাকে হয় সুশোভনের ঘরে বসে গল্প

করতে হবে কিংবা ছবি, ব্যালে, অপেরায় ঘুরে সময় কাটাতে হবে।

শরতের ইঙ্গিত এসেছে তাই আশঙ্কায় ভরে উঠেছে চারপাশ। প্রত্যেক বছর এ সময় গিজলার মনেও শঙ্কা জাগে। এমনি সময় একদিন যুদ্ধ বেধেছিলো। পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্যে সে উদাস হয়ে যায় আর কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কী যেন ভাবে!

আজকের দিন শরতের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। তেমন আলো নেই। কেমন যেন ফ্যাকাশে ভাব চারধারে। আজ গিজলার ছুটি নেই। বাগানের এক কোণে সে চুপ করে বসেছিলো। বাচ্চা আপন মনে কাছাকাছি খেলা করছে। মিসেস কোহেন আজ দু একদিন ধরে কাজ করতে বার হচ্ছে না। তার 'ফ্লু' হয়েছে। তাই তার স্বামীও সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি এসে স্ত্রীর সেবা করে না, শুধু সে কেমন আছে খবর নিয়ে গিজলার সংগে গল্প করে—অনেক কথা বলে নানা স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা করে।

সেদিনও যথারীতি একটু পরে মিস্টার কোহেন এসে অসঙ্কোচে তার পাশে বসে একটা হাত কোলে তুলে নিলো। গিজলা বাধা দিলো না, মিসেস কোহেনের ভয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো না! যা হয় হোক—এমনি একটা ভাব নিয়ে সে-ও মিস্টার কোহেনের হাত শক্ত করে চেপে ধরলো।

তোমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই গিজলা?

আছে, মৃদুস্বরে গিজলা উত্তর দিলো।

অনেক?

না, একজন বিশেষ বন্ধু আছে আমার।

মিস্টার কোহেন আর বেশি কৌতূহল দেখালো না। সে ভাবলো হয়তো জার্মানীতে তার সেই বিশেষ বন্ধু আছে। আর তার কথা মনে করে মাঝে মাঝে এখানে সে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে।

মিস্টার কোহেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তুমি রাত্তিরে কখন ঘুমোও গিজলা ?

গিজলা বললো, কোনো ঠিক নেই। তবে সাধারণত অনেকক্ষণ আমার ঘুম আসে না—

একটু ইতস্তত করে মিস্টার কোহেন বললো, তোমার সংগে আলাপ হবার পর আমারও অনেকক্ষণ ঘুম আসে না।

গিজলা হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না। সে জানে মিস্টার কোহেন তার কাছ থেকে কী চায়। শুধু অর্থের জন্যে নয়, আরও একটি কারণে সে তাকে একেবারে প্রথম থেকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। সুশোভনের মতো পণ্ডিতকে সে বুঝতে পারে না, কিন্তু এই কথা ভেবে তার অবাক লাগে যে দেহকে সে কেমন করে একেবারে অস্বীকার করতে পারে। তার জীবনে এমন করে কোনো গ্রীষ্ম গিজলা কাটায় নি। সুশোভনের সংগে যখন সে ঘুরে বেড়ায় তখন কিসের আকাঙ্খায় তার সারা দেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে, অথচ আশ্চর্য, পুরুষ হয়ে সুশোভন সেকথা বুঝতে পারে না কেন। গিজলা তাকে নানাভাবে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কোনো সাড়া পায় নি। তাই আজ মিস্টার কোহেনের কাছ থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে সে তার হাত প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরলো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে মিস্টার কোহেন বললো, ওই ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ গিজলা কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

দেখেছি—

তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে আজ।

অনেক ধন্যবাদ মিস্টার কোহেন।

চলো পাশের পাব থেকে কিছু খেয়ে আসি—

না না, ভয় পেয়ে গিজলা বললো, মিসেস কোহেন জানতে পারবে, আর বাচ্চাকে ছেড়ে আমি এখন বাড়ির বার হতে পারি না—

অধৈর্য হয়ে মিস্টার কোহেন বললো, কিন্তু আজ তোমার সঙ্গ ছাড়তে আমার কিছুতেই ইচ্ছে করছে না গিজলা—

গিজলা বললো, আমারও না। আপনি ছাড়া আমার এমন বন্ধু এখানে কেউ নেই। কিন্তু কী করবো বলুন ?

একটু ভেবে কোহেন বললো, ডিনারের পর তোমার সংগে দেখা করবো ?

গিজলা হেসে বললো, আপনার ইচ্ছে।

আমার সব সময় আজকাল তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে।

আমি সেকথা বুঝতে পারি।

একদিন ভাবলাম অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুপুরে বাড়ি চলে আসি—

এলেন না কেন ?

কারণ মিসেস কোহেন মাঝে মাঝে অফিসে টেলিফোন করে। শরীর খারাপ না হলে আগে বাড়ি এলে সন্দেহ করতে পারে—

আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভয় করেন, না ?

মিস্টার কোহেন সহজ হাসি হেসে বললো, সে তো বুঝতেই পারো, একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো, ভয় আমি কাউকে করি না, তবে সব সময় অপ্রীতিকর ব্যাপার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

গিজলা হেসে বললো, আমি সব বুঝতে পারি। এবার ছাড়ুন, বাচ্চাকে খাওয়াবার সময় হলো—

তাহলে আজ রাত্তিরে আবার দেখা হবে ?

গিজলা কথা না বলে মৃদু হেসে শুধু মাথা নাড়লো।

খুব বেশি রাত হয়নি তখনও, সবে নটা বেজেছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আটটার সময়। গিজলা মুখ বাড়িয়ে দেখলো মিসেস কোহেনের ঘর অন্ধকার। আর একটু পরেই মিস্টার কোহেন তার কাছে আসবে। এখনও হয়তো তার স্ত্রী ঘুমোয় নি তাই সে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে। গিজলা একবার মুখে ক্রীম ঘষলো, একবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো, হঠাৎ উঠে সারা অংগে এসেন্স ছড়ালো, তারপর কান পেতে কার পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে রইলো।

এমন আগ্রহ নিয়ে বহুদিন সে কারোর জন্যে প্রতীক্ষা করেনি। কার্ল আর টমাসের কথা সে প্রায় ভুলতে বসেছে। তাদের আদর সোহাগের কথা তার এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। তাই এখন তার কাছে কে আসবে সেকথা নিয়ে সে বেশি ভাবছে না, আসবার কারণ তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত দেহ বিপুল ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রতীক্ষা করছে যে কোনো মানুষের কঠিন স্পর্শের। তাই এখন তীব্র উত্তেজনায় সে ছটফট করছে আর মনে হচ্ছে সময় কাটছে না যেন।

বাইরে কোনো কোলাহল নেই। অনেকক্ষণ আগে সমস্ত পল্লী নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে পথিকের জুতোর খট খট আওয়াজ শোনা যায়। যারা দূরে কোথাও গ্রীষ্মের সন্ধ্যা কাটাতে গিয়েছিলো তারা ফিরে আসছে। গিজলা জানলা দিয়ে

বাইরে তাকালো। অনেক দূর থেকে যেন শীত আসছে, তারই ক্ষীণ আভাস বাতাসে ভাসছে। গিজলা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে প্রকৃতির সংগে যেন এক হয়ে যেতে চাইলো।

এখনও আসছে না কেন মিস্টার কোহেন? সে কি ঘুমিয়ে পড়লো? গিজলার মনে হলো, সে তার সংগে রসিকতা করে নি তো? আর একবার দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখবে কিনা ভাবতে না ভাবতে ঠক ঠক মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। আর সংগে সংগে দরজা খুলে গিজলা দেখলো নীল ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে মিস্টার কোহেন দাঁড়িয়ে আছে।

দুঃখিত। আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে গিজলা বললো, আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে আছি।

খাটের ওপর গিজলার পাশে বসে মিস্টার কোহেন বললো, আমার স্ত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে এলাম কিনা তাই দেরি হলো, গিজলার একটা হাত কোলে তুলে নিলো কোহেন তারপর তাকে চুম্বন করে বললো, আজ সারারাত আমি এখানে থাকবো।

আমি জানি, মৃদু হেসে গিজলা বললো, তাই তো বসে আছি আপনার অপেক্ষায়।

গিজলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কোহেন বললো, এখন থেকে হয়তো আমি রোজ রাত্তিরে তোমার কাছে এমনি করে চলে আসবো।

তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে গিজলা বললো, আপনাকে এমন নিবিড় করে পাওয়া আমার সৌভাগ্য। আমিও রোজ রাত্তিরে আপনাকে আমার ঘরে আশা করবো।

ঘরে নীল টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। সেই আলোয় কোহেনের

চেহারা অপরূপ মনে হচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন নেশা ধরে গেল গিজলার। কতোদিন সে এমন আনন্দের স্বাদ পায়নি। কোহেনের সোহাগে তার সারা দেহ মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে শুধু তার কানে কানে চাপা স্বরে বললো, দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দিন—বড়ো চোখে লাগছে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ শুনে গিজলার ঘুম ভেঙে গেল। মিসেস কোহেনের বাচ্চা রোজ সকালে এমনি করে তার ঘুম ভাঙায়। চোখ খুলে গিজলা দেখলো তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মিস্টার কোহেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না। তাকে মৃদু চুম্বন করে সাবধানে বাঁধন আলগা করে গিজলা দরজা খুললো। আর সংগে সংগে সে ভীষণ ভাবে চমকে উঠলো। বাচ্চা নয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস কোহেন। তাকে কিছু বলতে হলো না, বাইরে থেকে এ ঘরের খাট দেখা যায়।

গিজলাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘুমন্ত কোহেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মিসেস কোহেন, তুমি ভেবেছো দিনের পর দিন তোমার অপমান আমি এমনি করে সহ্য করবো? কী ভেবেছো তুমি আমাকে?

মিস্টার কোহেন কোনো রকমে স্ত্রীর হিংস্র বাঁধন ছাড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

তীক্ষ্ণস্বরে মিসেস কোহেন বললো, এই ঘরে সারা রাত কাটিয়ে আমাকে সেকথা জিজ্ঞেস করতে একটু লজ্জা করছে না তোমার?

এবার উষ্ণ স্বরে মিস্টার কোহেন বললো, তুমি বাড়িতে আজে বাজে মেয়ে মানুষ রাখলে আমি কী করবো। কাল রাত্তিরে আমি

বাইরে বেরোলে গিজলা আমাকে বলে তার ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছে—

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, আরও জোরে মিসেস কোহেন চিৎকার করে উঠলো, আমি এখুনি পাড়ার লোক জড়ো করে পুলিশ ডাকছি। আমার সংগে চালাকি করতে এসো না, আজ হাতে হাতে ধরেছি তোমায়। এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়বো না—

স্ত্রীর মেজাজ দেখে বেশ বিচলিত হয়ে নিজের দোষ কাটাবার জন্যে মিস্টার কোহেন বললো, তুমি বিশ্বাস করো আমার কোনো দোষ নেই। বাড়ির ঝিয়ের সংগে আমি অন্তরঙ্গতা করতে পারি না সেকথা তুমি তো জানো, খাট থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে মিসেস কোহেনের হাত ধরে সে বলে চললো, আমি ভেবেছিলাম সত্যি ওর অসুখ করেছে। একটু পরে ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তোমার ঘুম ভাঙিয়ে তোমাকে আর বিরক্ত করলাম না—

বাধা দিয়ে মিসেস কোহেন বললো, তুমি ইতর। তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বাড়ির ঝিয়ের সামনে তোমার সংগে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই—

চলো ঘরে গিয়ে তোমাকে আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—

তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, গিজলার দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে মিসেস কোহেন বললো, তোমাকে আমি সাত দিনের নোটিশ দিয়েছিলাম মনে আছে ?

হ্যাঁ।

আজ ঠিক সাত দিন হলো—

কিন্তু আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন—

না আমি ফিরিয়ে নিই নি। তোমার মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি, ভালোয় ভালোয় এখুনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, একটু থেমে মিসেস কোহেন বললো, আর যদি না গিয়ে আমার সংগে তর্কা তর্কি করবার চেষ্টা কর তাহলে আমি পুলিশে খবর দিয়ে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বো।

মিসেস কোহেন পুলিশের ভয় দেখাতে গিজলার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো। এতোক্ষণ সে অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু আর নয়। মিস্টার কোহেন তাকে ছোটো করে স্ত্রীকে যতো মিথ্যা কথা বললো সে ভাবতে পারেনি এমন মিথ্যা কথা কেউ বলতে পারে। তাই প্রথমে সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন মিসেস কোহেনের কথা শুনে সে ঠিক করলো যাবার আগে এদেরও কিছু শিক্ষা দিয়ে যাবে। অনেক দেখেছে সে, অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, অত্যাচারেব মধ্যে কাটিয়েছে অনেক সময়। কাজেই কিছুতেই আর তার ভয় নেই। যা হয় হোক। কিন্তু মিসেস কোহেন যে স্বামীর কথায় তাকে ছোটো করে দোষ দেবে তা সে কিছুতেই সহ্য করবে না।

তাই গিজলাও তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, কথায় কথায় পুলিশের ভয় আমাকে দেখাবেন না—

আমার মুখে মুখে তর্ক করতে এসো না গিজলা, তোমাকে আমি খুন করে ফেলতে পারি—

আমিও তা করতে পারি। ভুলে যাবেন না আমি কোন দেশের মেয়ে।

তাই তোমার চরিত্র এমন—

থামুন, বাধা দিয়ে গিজলা উত্তর দিলো, চরিত্র সম্বন্ধে আপনার স্বামীকে উপদেশ দিন।

এবার মিস্টার কোহেন গম্ভীর স্বরে বললো, সাবধান হয়ে কথা বলবে গিজলা।

আপনারাও সাবধান হয়ে কথা বলবেন। মুখ বুজে আপনাদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেছি বলে ভাববেন না আমিও আপনার মতো ভীতু, একটু থেমে মুচকি হেসে গিজলা বললো, সত্যি কথা বলবার সাহস যাদের নেই আমি তাদের ইঁদুরের মতো মনে করি বুঝলেন?

গিজলার মূর্তি দেখে বেশ ঘাবড়ে মিস্টার কোহেন বললো, আমরা তোমার সংগে তর্ক করতে চাই না। মিসেস কোহেন তোমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন, এ বাড়ি থেকে তুমি চলে যাও। ব্যস আর কোনো কথা নয়।

আমার মাইনে দিয়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু থানা পুলিশের ভয় দেখিয়ে আমাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না। সব সময় সত্যি কথা বলবার সাহস আমার আছে। জানেন তো, এখানকার পুলিশের সুনাম আছে। কথা শুনেই তারা বুঝতে পারে কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যা বলছে—

মিসেস কোহেন বললো, আমি এখুনি তোমার মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি—ওরা দুজন গিজলার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই গিজলা নিজের জিনিশপত্র গুছিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবলো, ভালোই হলো। সুশোভনের সংগে আলাপ হবার পর এখানে এমন ভাবে থাকতে তার আর ভালো লাগছিলো না। ব্রেকফাস্ট খেয়েই এখান থেকে সে বেরিয়ে পড়বে। সে আগেই ভেবে রেখেছিলো সটান গিয়ে উঠবে সুশোভনের বাড়ি। প্রয়োজন হলে পুলিশকে বলবে তার বাড়িতে সে ঝিয়ের কাজ করে। একথা

সুশোভন তাকে বলেছিলো একদিন। অনেক দিন নাচের সংগে সম্পর্ক নেই গিজলার। এবার সুশোভনের কথা মতো ব্যালে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে মন দিয়ে সে নৃত্যের চর্চা করবে। তাছাড়া আর কী করতে পারে সে। যখন সুযোগ এসেছে তখন কেন সে অবহেলা করবে।

জিনিশপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হতে গিজলার খুব বেশি সময় লাগলো না। সুশোভনকে টেলিফোন করে গিজলা জানালো, সে যেন এখন বাড়ি থেকে না বার হয়। অনেক খবর আছে, গিজলা এখুনি যাচ্ছে তার কাছে।

কিন্তু যাবার বেলায় পথ আগলে দাঁড়ালো মিসেস কোহেনের ছেলে, কোথায় যাবে তুমি ?

তাকে আদর করে গিজলা বললো, তোমার সংগে খেলা করতে নতুন লোক আসবে—

চাই না নতুন লোক। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

গিজলার চোখ ছলছল করে উঠলো। জেরাডসক্রশের বাড়ির চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে সে বললো, আমি আমার বাড়িতে যাচ্ছি—

আমিও যাবো তোমার সংগে। আমাকে একটুও ভালোবাসো না তুমি। কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছো না ?

মার কাছে যাও, আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। আমি আর একদিন এসে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো।

মা ভালো না, বাবা ভালো না। আমি জানি ওরা তোমাকে বকেছে বলে তুমি চলে যাচ্ছো। তুমি যেও না, আমি ওদের বলে দেবো তোমাকে যেন ওরা আর না বকে—

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যাই, গিজলা জোর করে বাচ্চাকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু গিজলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে সে কেঁদে উঠলো, যাবে না—তুমি যাবে না—

তার কান্না শুনে প্রায় ছুটে সেখানে এলো মিসেস কোহেন। গিজলার কাছ থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো, পাজি ছেলে, শিগগির ঘরে চলো—

ছুটো স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে স্টেশনের দিকে আসতে আসতে গিজলা অনেক দূর অবধি তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলো।

আগামী সপ্তাহে কেনসিংটনের এই বাড়ি সুশোভন ছেড়ে দেবে। ল্যাডব্রোক গ্রোভে সে খুব সস্তায় ঘর ঠিক করে এসেছে। সেখানে থাকবে সুশোভন। ল্যাণ্ড লেডিকে আগাম টাকা দিয়ে এসেছে। এখানেও কাল নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। সে শুধু ঘর ঠিক করে নি, একটা চাকরিও ঠিক করেছে। তার চেনা একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ। মাইনে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড। তাছাড়া টিপস্ আছে। ওতেই সুশোভনের চলে যাবে। গিজলাকে এ খবর দেবার জন্যে যখন সে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সে টেলিফোন করলো।

সাধারণত গিজলা সকালে আসে না। তাই সুশোভন তার অধীর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। তার কণ্ঠস্বর টেলিফোনে কেমন অস্বাভাবিক শোনালো যেন। হয়তো সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। একদিন গিজলার সংগে দেখা না হলে কিংবা তার খবর না পেলে সুশোভন অধৈর্য হয়ে ওঠে। নানা রকম অশুভ কল্পনা তাকে পেয়ে বসে আজকাল। শুধু মনে হয়, কখন দেখা হবে, কখন সে তার সব কথা শুনবে।

আজ রোদ নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। কয়েক দিন পরই

ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরোতে হবে। এদেশের শীতকে কখনও ভয় করে নি সুশোভন। এবার তার ভয় করছে। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে মতো আর যেখানে সেখানে বেড়ানো চলবে না, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। দীর্ঘকাল স্থায়ী গোধূলি আর উপভোগ করা চলবে না। আবার কবে গ্রীষ্ম আসবে।

যথাসময়ে দুটো স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে সুশোভনের ঘরে ঢুকে গিজলা বললো, আর জেরাডসক্রশে ফিরে যাবো না সুশোভন, তোমারে এখানেই থাকতে এলাম, মেঝেতে স্যুটকেস সশব্দে নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গিজলা খাটে শুয়ে পড়লো।

তার চেহারা দেখে ব্যস্ত হয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোমার গিজলা ?

সুশোভনের প্রশ্ন শুনে উত্তেজিত হয়ে খাটের ওপর উঠে বসে গিজলা বললো, বড়লোক যে এত নীচ হয় আর এমন মিথ্যা কথা বলতে পারে আমি তা ভাবতে পারি নি। আজ মিস্টার কোহেনের ওপর আমার ধারণা বদলে গেল—

সুশোভন আবার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ?

গিজলা আসল ব্যাপার গোপন করে গেল। মার কথা মনে পড়লো তার। আর একজনের ওপর নিজের সামান্য দুর্বলতার কথা সুশোভনকে বলা ঠিক হবে না। সে বললো যে মিস্টার কোহেন তাকে প্রায়ই এখানে ওখানে নিয়ে যেতে চাইতো, স্ত্রীর আড়ালে তার সংগে অন্তরঙ্গতা করতে চাইতো কিন্তু সে তাকে সামান্য প্রশ্রয় কখনও দেয় নি বলে আজ সকালে মিসেস কোহেনের সামনে তার নামে অপবাদ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। গিজলাও মুখ বুজে অপমান সহ্য করেনি, তাদের সংগে ঝগড়া করে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে। এখন সে সুশোভনের বাড়িতে কিছুদিন

থেকে বিশ্রাম করবে আর ব্যালে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে এদেশের নাচের কৌশল ভালো করে আয়ত্ত করে নেবে। তারপর সুবিধা মতো আর একটা কাজ ঠিক করে নেবার ইচ্ছে আছে গিজলার।

গিজলার মুখ থেকে সব কথা শুনে সুশোভন ম্লান হেসে বললো। তুমি ও বাড়ি ছেড়ে এসে ভালোই করেছো। অসম্মানের মধ্যে মানুষের একদিনও বাস করা উচিত নয়। আমার সংগে তোমার থাকবার ব্যবস্থা আমি করবো নিশ্চয়ই, একটু থেমে সুশোভন বললো, কিন্তু এর মধ্যে আমার দিক থেকে এমন একটা কারণ ঘটেছে যার জন্যে আমাকেও এখানকার বাস উঠিয়ে আগামী সপ্তাহে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে।

অবাক হয়ে গিজলা প্রশ্ন করলো, সে কী ? কোথায় যাবে তুমি ? কেন যাবে ?

একটু ভেবে সুশোভন সব কথা গিজলাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বললো, আজ শুধু তোমাকে গভীর ভাবে বোঝা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই।

গিজলা বললো, কিন্তু এমন করে তুমি তো চালাতে পারবে না। তোমার খুব কষ্ট হবে।

হেসে সুশোভন করলো, তোমার কষ্ট হয় না ?

আমার কথা আলাদা সুশোভন। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক কিছু সহ্য করতে শিখেছি—

বাধা দিয়ে সুশোভন বললো, আমিও সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার সংগে আলাপ হবার পর থেকে আমার মন সব সময় এক আশ্চর্য আনন্দে ভরে থাকে।

কিন্তু, বেশ হতাশ হয়ে গিজলা বললো, তাহলে তোমার সংগে আমার থাকা হবে না।

কেন ?

কারণ বাড়ি থেকে টাকা না এলে তোমার নিজের খরচ চালাতে বেশ অসুবিধা হবে। তোমার বোঝা হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

সুশোভন বললো, ভাবনা করবার কিছু নেই গিজলা। নিজের ওপর আমি কখনও বিশ্বাস হারাই না। তুমি আমার সংগে থাকলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তবে তোমার কষ্ট হতে পারে—

আমার আবার কষ্ট !

সুশোভন বললো, তোমাকে কথা দিয়েছিলাম ব্যালের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো। শুধু সেকথা আমার পক্ষে এখন রাখা সম্ভব হবে না বলে আমি খুব দুঃখিত গিজলা।

ম্লান হেসে গিজলা বললো, এতে তোমার দুঃখ পাবার কিছু নেই সুশোভন। আমার কপালটাই এমন। সব সামনে সাজানো থাকে কিন্তু আমি হাত বাড়ালেই কে যেন সেগুলো দূরে সরিয়ে নেয়—

সুশোভন বললো, নিজের ভাগ্যের দোষ দিও না। ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি শুধু কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখ আমি কী করতে পারি।

গিজলা বললো, এমন অবস্থায় আমি তোমার ওপর কিছুতেই নির্ভর করতে পারি না। কপাল যেমন হোক, নিজের ওপর নির্ভর করবার শক্তি আমার আছে। আমি এখনই এলফ্রিডাকে টেলিফোন করে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো—

কিন্তু এখন ব্যস্ত হবার কী আছে ? কিছুদিন তুমি আমার এখানে অনায়াসে বিশ্রাম করতে পারো ?

গিজলা হেসে বললো, মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে বিশ্রাম করা যায় না সুশোভন—আগে এলফ্রিডার সংগে কথা বলে নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিই। একটু বসো, আমি ওকে একটা টেলিফোন করে আসি—সুশোভন কিছু বলবার আগেই গিজলা সিঁড়ি বেয়ে টেলিফোনের কাছে নেমে এলো। সুশোভন তাকে বাধা দিতে পারলো না। সত্যিই তো এই অবস্থায় এই মুহূর্তে গিজলার সমস্ত ভার নিতে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। আর তাকে অভাবের মধ্যে রাখবার কোনো অধিকারও নেই। কাজেই এখন তার যা খুশি সে তাই করুক।

টেলিফোনে পাওয়া গেল এলফ্রিডাকে। গিজলার আশঙ্কা ছিলো হয়তো এ সময় তাকে পাবে না। কারণ এ সপ্তাহে কোন সময় তার কাজ পড়েছে তা জানা ছিলো না। গিজলার গলা শুনে এলফ্রিডা জানালো একটু আগে জেরাডসক্রশে ফোন করে সে গিজলার খোঁজ করেছিলো কিন্তু মিসেস কোহেন তাকে কোনো প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই ফোন রেখে দেয়। গিজলা তখন এলফ্রিডাকে আজ সকালকার ব্যাপার খুলে বললো। সব শুনে এলফ্রিডা জানালো এখুনি চলে আসতে পারলে আজ বিকেল থেকেই হাসপাতালে গিজলার কাজ হয়ে যাবে। সেকথা বলবার জন্যে সে তাকে আজ টেলিফোন করেছিলো। খুশি হয়ে গিজলা বললো, আজ থেকেই সে কাজ করবে। তারপর কেমন করে ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতালে যেতে হয় সেকথা জেনে এলফ্রিডাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে গিজলা ফোন রেখে দিলো।

উচ্ছ্বসিত হয়ে সুশোভনের ঘরে প্রবেশ করে গিজলা বললো, কপালের দোষ সব সময় দেয়া চলে না সুশোভন, আজ থেকেই একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।

অবাক হয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ?

এলফ্রিডার হাসপাতালে।

কিন্তু নার্সের কাজ তুমি কি পারবে ?

আমি সব পারি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুশোভন বললো, পারতেই হবে। কিন্তু সেখানে কাল গেলেই তো পারতে ?

না, বরং পরে ছুটি নিয়ে তোমার সংগে এসে দু একদিন থেকে যাবো। এলফ্রিডা প্রায় অমন ছুটি নেয়। চলো, আমাকে ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতালে পৌঁছে দেবে সুশোভন।

নিশ্চয়ই। রাস্তায় কোথাও লাঞ্চ খেয়ে নেয়া যাবে, কী বল ?

হ্যাঁ, গিজলা একটা স্যুটকেস তুলে নিয়ে আর একটা সুশোভনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, এটা কিন্তু তোমাকে বইতে হবে। ভয়ানক ভারী, পারবে তো ?

সুশোভন হেসে বললো, আমাকে দুটো স্যুটকেস দিয়ে তুমি খালি হাতে চলো—

রাস্তায় বেরিয়ে সুশোভনের মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। গিজলা তার বাড়িতে থাকবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলো। কিন্তু এক-দিনের জন্যেও তাকে আশ্রয় দিতে পারলো না সে। স্তিমিত আকাশের দিকে চোখ তুলে সুশোভনের মনে হলো, কেন এমন হয় !

একটু বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু তা করতে ভয় পায় না গিজলা। মিসেস কোহেনের বাড়ির চেয়ে ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতাল অনেক ভালো। কেউ সারাদিন খিট খিট করে না,

ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে অন্য নার্স'রা তার সংগে হেসে কথা বলে আর খুব যত্ন নিয়ে সস্নেহে কাজ শেখায়। শুধু ডাক্তার কিংবা নার্স নয়, রুগীরাও গিজলাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। সে যখন ডিউটিতে থাকে তখন তারা তার নাম ধরে ডেকে নানা গল্প করে। কেউ কেউ বলে, আমি সেরে গেলে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে হবে তোমায়। গিজলা হেসে বলে, নিশ্চয়ই যাবো। খুব অল্পদিনের মধ্যে গিজলার কাজে আর ব্যবহারে সকলে খুব খুশি হয়ে উঠলো।

এখানে তার ছুটি একটু বেশি। যেদিন সকালে কাজ করতে হয় সেদিন বিকেলে ছুটি আর যেদিন বিকেলে ডিউটি থাকে সেদিন সকালে তার কাজ থাকে না। তাছাড়া যখন রাত্তির নটা থেকে কাজ করতে হয় তখন সমস্ত দিন তার অবসর।

এখানে কাজ নেবার পর সুশোভনের সংগে গিজলার কম দেখা হয়। সকালে ছুটি থাকলে অতো দূর যেতে ইচ্ছে করে না তার। আর বিকেলে বড়ো ক্লান্ত লাগে। তা ছাড়া গেলেই আজকাল সুশোভনের দেখা পাওয়া যায় না। সেও সারাদিন কাজ করে।

গিজলার কাছ থেকে সুশোভনের সব কথা শুনে এলফ্রিডা বললো, এমন পাগলের মতো কাণ্ড করবার কোনো মানে হয় না। তুমি কিন্তু এবার সাবধান হয়ো। একজনকে নিয়ে অতো বাড়াবাড়ি করো না—

আর করবো না, নিশ্বাস ফেলে গিজলা বললো, এতোদিন এদেশে রইলাম অথচ কিছুই দেখা হলো না আমার। একদিন ভালো করে নাচতেও পারলাম না।

এলফ্রিডা বললো, এখানে অনেক নতুন লোকের সংগে আলাপ

হবার সুযোগ আছে, তুমি কিছুতেই সে-সুযোগ ছেড়ো না যেন—

গিজলা মৃদু হেসে মাথা নাড়লো।

অনেকের সংগে না হোক, একজনের সংগে এর মধ্যেই গিজলার বেশ আলাপ হয়েছে। এখানকার একজন রুগী। বয়সে সে গিজলার সমান হবে। নাম কিংসলে। সে প্রায় সেরে উঠেছে। আর দু একদিনের মধ্যেই হাসপাতাল ছেড়ে যাবে। মা ছাড়া কিংসলের আর কেউ নেই। শুধু সে তাকে রোজ দেখতে আসে। গিজলার চেহারা দেখে সে অনেকক্ষণ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। গিজলা বুঝতে পারে সে তার দিকে তাকিয়ে কী ভাবে, তাই মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সে কিংসলের সেবা করে।

একদিন মা চলে যেতেই কিংসলে বললো, আমি যখন এখান থেকে চলে যাবো তখন বাইরে আমার সংগে তুমি দেখা করবে গিজলা ?

যদি চাও তাহলে করবো।

নিশ্চয়ই আমি তোমার সংগে দেখা করতে চাই।

নিজের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা কিংসলে তাকে বলেছে। আর তার কথা শুনতে শুনতে গিজলা কিসের সংকেতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে বারবার। বেকার স্ট্রীটের এক ক্যাবারেতে কিংসলে নাচে। তার পরিচয় পেয়ে গিজলাও নিজের কথা বলেছে তাকে আর জানিয়েছে এমন পরিবেশে কিংসলের মতো লোকের সংগে আলাপ হওয়া তার সৌভাগ্য। ঠিক হলো একদিন কিংসলের সেই ক্যাবারেতে গিজলাও যাবে। আর দুচার দিনের মধ্যেই হাসপাতাল ছেড়ে যাবে কিংসলে।

এখানে আসবার পর থেকে থেকে গিজলার মনে হয় সে শুধু সময় নষ্ট করেছে। ইচ্ছে করলেই আরও অনেকের সংগে আলাপ করে সে পরিপূর্ণ ভাবে নানা আনন্দ উপভোগ করতে পারতো। আজ দারুণ ক্ষুধায় তার দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর অকারণে সুশোভনের ওপর রাগ হয় তার। মনে হয় শুধু তার জন্যে সে নিজেকে সব সুখ সাধ থেকে বঞ্চিত করে রাখতে বাধ্য হয়েছে। গিজলার মনের যখন এমন অবস্থা তখন সুশোভন একদিন তাকে টেলিফোন করলো। ল্যাডব্রোক গ্রোভে তার নতুন বাড়ি গিজলা দেখে এসেছে। মুখে কিছু না জানালেও সে-ঘর দেখে হতাশ হয়েছে সে। অমন ঘরে বেশিক্ষণ থাকবার কল্পনা গিজলা আর করতে পারে না। সে ঠিক করেছে সুশোভনকে এড়ানো একান্ত অসম্ভব হলে তার সংগে বাইরে কোথাও অল্পক্ষণের জন্যে দেখা করবে। ও ঘরে আর কখনও যাবে না। আর সময় হলে কিংসলের কথাও সে তাকে জানিয়ে দেবে। তার সংগে আলাপ গভীর হয় নি গিজলার কিন্তু সে নাচে—এই কথা শোনবার পর তার চিন্তা প্রধান হয়ে উঠেছে। সে অধৈর্য হয়ে ভাবে, কবে কিংসলে হাসপাতাল থেকে বেরোবে—কবে সে তাকে সংগে করে নিয়ে যাবে তার বেকার স্ট্রীটের ক্যাবারেতে।

কয়েক দিন পর সকাল বেলা গিজলা খবর পেলো, আজ হাসপাতাল ছেড়ে কিংসলে চলে যাবে। সে একেবারে সেরে গেছে। সেদিন সকালে তার ডিউটি ছিলো না তবু সে নিঃশব্দে এসে কিংসলের খাটের পাশে দাঁড়ালো।

তাকে দেখতে পেয়ে কিংসলে বললো, আমি জানতাম তুমি আসবে। হাসপাতাল ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার

সেবায় আমি মুগ্ধ হয়েছি গিজলা। বল কবে তুমি আমার সংগে চা খাবে ?

এ সপ্তাহে হবে না, সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে গিজলা বললো, আমার রোজ বিকেলে ডিউটি আছে। আগামী সপ্তাহে যে কোনো দিন বিকেলে আমি তোমার সংগে দেখা করতে পারি।

সোমবার বিকেলে ?

হ্যাঁ, বল কোথায় দেখা করবো ?

একটু ভেবে কিংসলে বললো, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখন বাড়িতে কিছুদিন আমাকে বিশ্রাম করতে হবে—

নিশ্চয়ই, গিজলা হেসে বললো, সুবোধ ছেলের মতো তোমার তা করা উচিত।

কিংসলেও হাসলো, কাজেই সোমবার তুমি আমার বাড়িতে এসে চা খেও। তারপর দুজনে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাবে ?

না, তোমার শরীর একেবারে সেরে না গেলে ঘোরাঘুরি করা চলবে না।

কিংসলে রসিকতা করলো, তোমার মতো নার্সের সঙ্গ যদি পাই তাহলে আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রুগী হতে রাজি—আমার রোগ যেন কোনোদিনও না সারে।

কিংসলের রসিকতা বুঝতে না পেরে গিজলা বললো, রোগ সারবে না কেন ? কিছুদিন বিশ্রাম করলেই তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।

সেদিন আর রসিকতার জের টানবার চেষ্টা না করে গিজলাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কিংসলে হাসপাতাল থেকে চলে গেল। তার বুড়ি মা এসেছিলো তাকে নিয়ে যেতে। ছেলের কথা মতো

গিজলাকে সোমবার বিকেলে তাদের সংগে চা খেতে যাবার জন্যে সেও বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানালো।

অনেক ধন্যবাদ, গিজলা মাথা নেড়ে বললো, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

কিংসলের সংগে গিজলার আলাপ ঘন হতে খুব বেশি দেরি হলো না। কিসের সন্ধানে তার সারা মন যেন উন্মুখ হয়েছিলো। কিংসলের মধ্যে সে খুঁজে পেলো সব কিছু। সোমবার বিকেলে চা খেতে গিয়ে তাদের বাড়িতে সে অনেকক্ষণ ছিলো। হাসপাতাল থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কিউ গার্ডেনসের কাছেই কিংসলের বাড়ি। সে যেতেই হাসিমুখে তার মা তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

এসো এসো, আমরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, সুন্দর ভাবে সাজানো বসবার ঘরে কিংসলের মা গিজলাকে নিয়ে বসালো, এক মিনিট বসো, আমি ওকে খবর দিচ্ছি—

মৃদুস্বরে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, শরীর কেমন আছে ওর আজকাল ?

খুব ভালো, কাল তো কিউ গার্ডেনসে ও বেশ অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলো।

গিজলা হেসে বললো, তাই নাকি ?

তার মা বেরিয়ে যেতে ঘরের চারপাশে গিজলা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। সহজেই বোঝা যায় কোনো অভাব নেই এদের। এরা ধনী।

দারিদ্র্যকে সর্বান্তকরণে গিজলা ভয় করে। তাই কোথাও দারিদ্র্যের ছায়া দেখলে সে পালিয়ে যেতে চায়।

এখনও ঘরে আগুন জ্বালা শুরু হয় নি। গিজলা তাকিয়ে দেখলো এদের এখানে কয়লার আগুনের ব্যবস্থা আছে। আর খুব বেশি দেরি নেই, শিগগিরই ঘরে ঘরে আগুন জ্বালা শুরু হবে। শরৎ শেষ হয়ে এলো। বাইরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। চারপাশ ফ্যাকাশে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকের মধ্যে শির শির করে।

এই যে গিজলা, ঘরে ঢুকে আন্তরিকতার সুরে কিংসলে বললো, কেমন আছো?

ভালো। তুমি?

খুব ভালো—

শুনলাম কাল কিউ গার্ডেনসএ বেড়িয়ে এলে?

মা বলেছে বুঝি, কিংসলে হেসে বললো, তবে ঘুরে বেড়াতে আজকাল আর ভালো লাগে না, বেশ শীত লাগে, ম্লান হেসে কিংসলে বললো, গ্রীষ্মের সময় তোমার সংগে আলাপ হলো না এই দুঃখ—

কেন? কৌতুকের হাসি হেসে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, অন্য কতো, বন্ধু তো ছিলো তোমার—

কিংসলেও হেসে বললো, ছিলো। তাদের সংগে ঘুরেও বেড়াতাম। কিন্তু কোনো বিশেষ বন্ধু আমার ছিলো না যাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছে করতো। একটু থেমে মুচকি হেসে কিংসলে আবার বললো, এতোদিন পর বোধ হয় আমার বিশেষ বন্ধুর অভাব মিটলো।

ধন্যবাদ, সলজ্জ হাসি হেসে গিজলা বললো, কবে থেকে তুমি আবার ক্যাবারেতে নাচতে আরম্ভ করবে?

কিংসলে বললো, আর বিশ্রাম করতে আমার একটুও ভালো

লাগছে না। তুমি ভালো করেই জানো নাচ বন্ধ করে বসে থাকা একজন নৃত্যশিল্পীর পক্ষে কী কষ্টকর!

তা আর জানি না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গিজলা বললো, নিজেকে দিয়ে সেকথা আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারি —আর কোনো দিন বোধ হয় আমার নাচবার সুযোগ হবে না—

কেন হবে না? গিজলাকে উৎসাহ দিয়ে কিংসলে বললো, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমার ক্যাবারেতে মাঝে মাঝে তুমি অনায়াসেই নাচতে পারো।

কিন্তু ওরা কি নাচতে দেবে আমাকে?

কেন দেবে না? তোমার ইচ্ছে থাকলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। তোমাকে পেয়ে ওরা খুব খুশি হবে—

বাধা দিয়ে গিজলা বললো, কিন্তু হাসপাতালের চাকরি? দুটো কাজ একসংগে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—

শান্ত স্বরে কিংসলে বললো, তুমি তা করতে যাবেই বা কেন? হাসপাতালে আমি তোমাকে দেখতাম আর অবাক হয়ে ভাবতাম কেন তুমি সেখানে গেলে!

মৃদুস্বরে গিজলা বললো, কারণ এদেশে আমি ও ধরনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারি না—

কিংসলে বললো, ইচ্ছে থাকলে অনেক উপায় বের করা যায়। যাহোক, তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমার ক্যাবারেতে তোমার নাচবার ব্যবস্থা করি?

অনেক ধন্যবাদ তোমাকে কিংসলে। আমি খুশি হয়ে তোমাকে অনুমতি দিলাম। কবে যাবো তোমার সংগে বল?

একটু ভেবে কিংসলে বললো, এই শনিবারের পরের শনিবার।

যদি সেদিন তোমার ছুটি না থাকে তাহলে তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো দিন।

ঠিক আছে। আমি তোমাকে যথা সময়ে জানাবো। আপাতত এই ঠিক রইলো।

গিজলার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় কিংসলে বললো, তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি খুব ভালো নাচতে পারো।

একদিন তো পারতাম। অনেক দিন অভ্যেস নেই। এখন কী করবো বলতে পারি না।

বেশ জোর দিয়ে কিংসলে বললো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুদিনেই তুমি সব ঠিক করে নিতে পারবে। তোমার পা যেন নাচের জন্যেই তৈরী হয়েছে।

এতো প্রশংসায় একটু লজ্জা পেয়ে গিজলা বললো, দেখি কী করতে পারি।

সেই ঘরে হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে কিংসলের মা এলো। সংগে সংগে ওরা দুজন উঠে ওকে সাহায্য করতে লাগলো সেগুলো সামনের বড়ো গোল টেবিলে সাজিয়ে রাখতে।

গিজলা বললো, আপনি একা একা কষ্ট করলেন কেন? আমাকে ডাকলেই তো পারতেন?

কিংসলে হেসে বললো, সংসারের সব কিছু এখনও একা করতে পারে বলে মার খুব অহঙ্কার।

বুড়ি ঝঙ্কার দিয়ে বললো, থামো বাছা। একটি তো ছেলে তুমি—সংসারে কী এমন কাজ যে একা করতে পারবো না?

এমনি করেই সেদিন চা খাওয়া শেষ হলো।

কয়েক দিন পর সন্ধ্যেবেলা বেকার স্ট্রিটের ক্যাবারেতে

কিংসলের সংগে গিজলা প্রথম এলো। নরনারীর কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে চারধার। নাচের বাজনা বেজে চলেছে। একজন মেয়ে করুণ ফরাসী গান গাইছে। অনেক দিন পর মদের গন্ধ গিজলার নাকে বড়ো মিষ্টি লাগলো। লণ্ডনে আসবার পর কোনো ক্যাবারেতে কখনও সে যায় নি, দেশে থাকতে ছেলেবেলায় প্রায়ই যেতো। আজ অনেক দিন পর তার আবার অতীতের কথা মনে পড়লো আর ছেলেমানুষের মতো অবাক হয়ে বারবার সে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বাজনা শুনতে শুনতে নাচবার জন্যে তার সমস্ত শরীর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

তাকে ছোটো একটা টেবিলের সামনে জিনের গ্লাশ দিয়ে বসিয়ে রেখে কিংসলে ভেতরে চলে গেছে। বলেছে, শিগগির ফিরে আসবে। তার ফিরে আসবার অধীর প্রতীক্ষা করছে গিজলা। সে ফিরে এলে জিনের গ্লাশে চুমুক দেবে। সে দূরে গ্লাশ সরিয়ে রাখলো।

চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে গিজলা হঠাৎ সব ভুলে গেল। কোনো বিপর্যয় যেন ঘটেনি তার জীবনে, যুদ্ধ তছনছ করে নি তার সংসার। সে যেন ঠিক তেমনি আছে—সেই ব্যালেরিণা হবার পর যেমন ছিলো। মনে মনে সে বারবার কিংসলেকে ধন্যবাদ দিলো। কতো অল্প সময়ে, কতো সহজে সে তার সব নৈরাশ্য দূর করে দিলো। তার সংগে আগে আলাপ হলে হয়তো গিজলার সব ক্লান্তি এতো দিনে দূর হয়ে যেতো।

আজ এই ক্যাবারের উজ্জ্বল আলোয় অসংখ্য নর নারীর কলগুঞ্জনের মাঝে বসে গিজলার নিজেকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। এখানে কিংসলের সংগে রোজ আসতে পেলে আর কিছু সে চাইবে না। কিন্তু কোথায় কিংসলে?

উৎসুক চোখে গিজলা তাকে খুঁজতে লাগলো।

আরও অনেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। এখানে যারা এসেছে তারা সকলেই বোধহয় ইংরেজ। গিজলা মনে মনে ভাবলো, এখন ওরা শুধু তাকিয়ে দেখছে কিন্তু সে নিশ্চিত জানে কিংসলের সংগে নাচবার পর তার প্রশংসায় এখানকার প্রত্যেকে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। কেউ হয়তো লক্ষ্য করলো না, গিজলার চোখে মুখে অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো। আজ অপূর্ব নাচ নাচবে সে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে কিংসলে বললো, দুঃখিত তোমাকে অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এ কী, গ্লাশ যে যেমনকার তেমন পড়ে আছে—

আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম কিংসলে, মৃদু হেসে গিজলা বললো, তুমিও আমার সংগে কিছু খাও ?

কিংসলে উঠে গিয়ে নিজের জন্যেও জিনের ছোটো গ্লাশ নিয়ে এসে বললো, আর মিনিট কুড়ি পর তোমাকে নাচতে হবে—প্রস্তুত হও।

আমি একা ?

হ্যাঁ।

কিন্তু পোশাক যে নেই আমার।

কিংসলে বললো, কোনো ক্ষতি নেই। তোমার ব্যবস্থা করবার জন্যেই আমি ভেতরে গিয়েছিলাম। এর পরের দিন এরাই তোমার পোশাক আনিয়ে রাখবে। আজ যাবার আগে মাপ দিয়ে যেও—

কিন্তু প্রথম দিন আমি তোমার সংগে নাচতে চেয়েছিলাম ?

কিংসলে হেসে বললো, বল কোন নাচ নাচবে ?

গিজলা বললো, মনে হচ্ছে সাধারণ জিপসি নাচ এদের ভালো লাগবে।

জিপসি নাচ? জিনের গ্লাশে চুমুক দিতে দিতে একটু ইতস্তত করে কিংসলে বললো, কিছু মনে করো না গিজলা। অত্যন্ত দ্রুত তালের নাচ। তুমি বলেছো এখানে একবারও নাচো নি। অভ্যেস না থাকলে অনেকদিন পর তোমার পক্ষে ও নাচ নাচা কি কঠিন হবে না?

গিজলা হেসে বললো, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নেচে এইমাত্র স্টেজ থেকে নেমে এলাম। আর আজ এখানে বসে এই বাজনা শুনতে শুনতে ভাবছি মনে হচ্ছে আমিও রোজ সন্ধ্যায় নেচেছি। একদিনও বাদ দিই নি।

কিংসলে বললো, এমনি আত্মবিশ্বাস প্রত্যেক নৃত্য শিল্পীর থাকা দরকার। তোমার কথা শুনে খুশি হলাম গিজলা। চলো এবার আমরা স্টেজে যাই।

ওরা দুজন উঠে দাঁড়ালো। একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। কাজেই স্টেজে উঠতে সঙ্কোচ হলো না গিজলার। কোন সুরের তালে তালে নাচবে সেকথা গিজলার সংগে পরামর্শ করে ঠিক করে নিয়ে যারা বাজনা বাজাচ্ছিলো কিংসলে তাদের জানিয়ে দিলো।

গিজলাকে আজ আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। সে স্টেজে উঠে দাঁড়াতেই প্রত্যেকের চোখ পড়লো তার ওপর। আর সকলে অনেকক্ষণ ধরে হাত তালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো।

যথাসময়ে কিংসলে যেমন বলেছিলো তেমন বাজনা বেজে উঠলো। আর ওরা দুজন শুরু করলো দ্রুত তালের জিপসি নাচ। কথা বন্ধ হয়ে গেল লোকের। হাতের কাছে গ্লাশ যেমনকার

তেমন পড়ে রইলো। সকলে সব ভুলে তাকিয়ে রইলো গিজলার দিকে। এই ক্যাবারেতে এর আগে ওরা কেউ আর কখনও এমন নাচ দেখে নি। আর কিংসলে হঠাৎ গিজলার মতো অভিজ্ঞ মেয়েকে পেয়ে দিশাহারা হয়ে উঠলো। সে এই ক্যাবারেতে অনেকের সংগে নেচেছে কিন্তু তারা কেউ গিজলার মতো এমন সাড়া জাগাতে পারে নি তার মনে—এমন আশ্চর্য তৃপ্তিও দিতে পারে নি।

তার একটা কারণ আছে অবশ্য। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা এমন ক্যাবারেতে নাচতে আসে না, যারা এখানে চাকরির জন্যে আসে তারা অতি সাধারণ মেয়ে—শুধু নাচতে জানে। নাচের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে মাথা ঘামায় না।

নাচের দিক থেকে বিচার করতে গেলে কিংসলে নিজেও হয়তো তাদের মতোই সাধারণ। অন্য কোথাও প্রথমে সুবিধা হয় নি বলে সে নাচ অভ্যাসের জন্যে এই ক্যাবারেতে চাকরি নিয়েছিলো। তাছাড়া এখানকার ম্যানেজার তার বন্ধু।

কিংসলের টাকার অভাব নেই। অনেকদিন থেকে তার ইচ্ছে সে একটা নাচের দল খোলে। তারপর ঘুরে বেড়ায় সারা পৃথিবীময়। এই ক্যাবারেতে যোগ দেবার সময় সে উদ্দেশ্যও তার ছিলো। সে ভেবেছিলো এখান থেকে যোগ্য লোক বেছে নিতে তার বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে মনের মতো একটি লোকও এখানে পায় নি।

তাই আজ গিজলাকে পেয়ে সে আবার নতুন করে পৃথিবী ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন দেখলো। এবার বোধহয় তার স্বপ্ন সত্য হবে। কিংসলের সারা দেহমন খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো। নাচ শেষ হয়ে যাবার পর সব ভুলে স্টেজের ওপর গিজলাকে দৃঢ়

আলিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে তার কানের কাছে মুখ এনে সে বললো, অপূর্ব !

মৃদুস্বরে গিজলা বললো, ধন্যবাদ !

সেই ক্যাবারেতে এমন হাত তালির শব্দ বোধহয় আর কখনও শোনা যায় নি। সারা ঘর মুখর হয়ে উঠেছে গিজলার প্রশংসায়। ম্যানেজার ছুটে এসে তার হাত ধরে তাকে বার বার অভিনন্দন জানালো।

কিন্তু গিজলার চোখে তখন ঘোর লেগেছে। অবশ হয়ে গেছে তার সমস্ত শরীর। সে যেন লণ্ডনে নেই, এ তো বেকার স্ট্রীটের ছোটো ক্যাবারে নয়। কার্ল আছে ভেতরে কোথাও, সকলের অলক্ষ্যে সন্তর্পণে টমাস এসে তার সংগে এখুনি আলাপ জমাতে চাইবে, ফ্রেডারিকা তার দোষ ধরবার জন্যে বারবার চারপাশে ঘুরে ফিরছে।

হাত তালির শব্দ গিজলার কানে গেল না, ম্যানেজারের প্রশংসা সে শুনতে পেলো না—কিংসলের বুকে মাথা রেখে ঠাণ্ডা পাথরের মতো অনেকক্ষণ সেই স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই রাত্রে ট্যাক্সিতে গিজলাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার সময় অনেক কথা বললো কিংসলে। কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে গিজলার খুব কাছে সরে এসে সে তার একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিলো।

ঘন কুয়াশা জমেছে। শীতের ভারী হাওয়ায় শরীর কেঁপে ওঠে। দিন কয়েক আগে তুষার পাত হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই এখন। টিউব ট্রেনের শব্দও কানে আসে না। দুটো আলো জেলে সাবধানে মন্থর গতিতে ট্যাক্সি চালাচ্ছে ড্রাইভার।

কিংসলে জিজ্ঞেস করলো, আবার কবে আসবে গিজলা ?

গিজলা বললো, এই সপ্তাহে বিকেলে আমার একদিনও কাজ নেই। আমি রোজ আসতে পারি?

ধন্যবাদ, নিশ্চয়ই তুমি রোজ আসবে, একটু থেমে গিজলার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিংসলে বললো, আজ তোমার সংগে নেচে আমার এতোদিনের সাধনা সার্থক হয়েছে। তুমি না এলে ওখানে আমার নাচতে ভালো লাগবে না।

গিজলা হেসে বললো, কিন্তু আমি তো রোজ আসতে পারবো না। আগামী সপ্তাহ থেকে আবার সন্ধ্যেবেলা আমার কাজ থাকবে। তখন কী করবে তুমি?

তোমাকে না পাওয়ার দুঃখে আমার পদক্ষেপ মন্থর হবে শুধু।

কেন? ওখানে তো কতো মেয়ে দেখলাম—

তারা কেউ তোমার মতো নাচতে পারে না। তোমার সংগে নাচলে আমার নিজেরও অনেক উন্নতি হবে।

খুশি হয়ে গিজলা বললো, আমি আরও অনেক ভালো নাচতে পারতাম। অনেকদিনের অনভ্যাস বলে এখন অনেক ত্রুটি নিজেই বুঝতে পারি।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কিংসলে বললো, তোমাকে নাচতেই হবে গিজলা। আমি অনেকের নাচ দেখেছি, অনেকের সংগে নেচেছি কিন্তু তোমার মতো আশ্চর্য নৃত্য কৌশল আমি আর কখনও দেখিনি। তোমার প্রত্যেক অঙ্গ যেন নাচের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। এমন প্রতিভা তুমি কিছুতেই নষ্ট করো না।

গিজলা ম্লান স্বরে বললো, ইচ্ছে করে তো নষ্ট করছি না। কী করবো বল? উপায় নেই। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। কী নিদারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি দিন কাটাই তোমাকে বলতে পারবো না কিংসলে!

গিজলাকে সস্নেহে আদর করে কিংসলে বললো, নিরাশ হয়ো না। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো—

বাধা দিয়ে গিজলা বললো, কী করতে পারো তুমি? জীবনের শুরু থেকে আমার কপাল কেবলই আমার সংগে প্রবঞ্চনা করে চলেছে—

যা-ই ঘটুক তোমার জীবনে, এমন প্রতিভা কিছুতেই নষ্ট হতে পারে না, একটু ভেবে কিংসলে বললো, যদি অনুমতি দাও একটা কথা বলবো?

বল?

আমি যদি একটা নাচের দল খুলি তুমি তাতে ব্যালেরিণা হয়ে যোগ দেবে?

গিজলার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল, কিন্তু কেমন করে? পুলিশ আমাকে যে অন্য কোনো রকম কাজ করতে দেবে না।

কেন দেবে না? তুমি যদি এদেশে বিয়ে কর তাহলেই তো সব বাধা দূর হয়ে যায়?

কিংসলের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সলজ্জ হাসি হেসে গিজলা বললো, এদেশে কে বিয়ে করবে আমাকে?

কিংসলে গিজলাকে আবার আদর করে হেসে বললো, কোন একজন, যে তোমার নাচ দেখে আর তোমার সংগে নেচে দেখে দিন কাটতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে।

কিছু না বোঝার ভান করে দুই চোখে প্রচুর কৌতূহল নিয়ে গিজলা জিজ্ঞেস করলো, কে সে?

কিংসলে উত্তর না দিয়ে গিজলার কৌতূহলী চোখ মুখ অজস্র চুম্বনে ভরে দিলো।

হাসপাতালে নিজের ঘরে ফিরে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না গিজ্‌লার। রাত আর নেই। আর একটু পরেই ভোর হবে। না ঘুমিয়ে কেটেছে গিজ্‌লার অনেক রাত। কিন্তু আজকের মতো আর কখনও তার শরীরে এমন শিহরণ খেলে যায় নি বার বার। সে যেন কার কাছ থেকে হারানো দিন ফিরে পাবার সংকেত পেয়েছে, নতুন করে বেঁচে ওঠার মন্ত্র শুনেছে কানে। না, এবার হয়তো কপাল তাকে প্রবঞ্চনা করতে পারবে না। সব দুঃখ বাধা প্রতিকূল পরিবেশ জয় করে নেবার শক্তিতে সে দুর্বার হয়ে উঠেছে। সে প্রচুর আহার করবে, কোনো দৈন্য আচ্ছন্ন করবে না তার দেহমন, নৃত্যের সাধনায় কিংসলের সংগে কাটিয়ে দেবে সারা জীবন। এক অজ্ঞাত শক্তি এবার তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাকে নিশ্চিন্ত করেছে। বিছানায় শুয়ে আনন্দে গিজ্‌লা এ পাশ ওপাশ করতে লাগলো। কিছুতেই ঘুম এলো না তার।

পরদিন কাজে যাবার আগে খাবার সময় এলফ্রিডা গিজ্‌লাকে জিজ্ঞেস করলো, কাল অতো রাত্তির অবধি কোথায় ছিলে ? সুশোভন দুবার তোমাকে টেলিফোন করেছিলো।

সুশোভনের নাম শুনে গিজ্‌লার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। বিরক্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কেন ?

তা তো জানি না, বোধহয় কোনো দরকার আছে।

কোনো দরকার নেই। আবার ফোন করলে তুমি বলে দিও আমি আজকাল সব সময় ব্যস্ত থাকি, আমাকে ফোনে পাওয়া যায় না।

এলফ্রিডা জিজ্ঞেস করলো, তোমার সংগে কি ওর ঝগড়া হয়ে গেছে ?

না। কিন্তু ওকে আমার আর ভালো লাগে না। ওর ওখানে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে আর আমার নেই।

এলফ্রিডা বললো, সেকথা আমি তো তোমাকে অনেক আগেই বলেছিলাম। ওর মতো লোককে তোমার ভালো লাগতে পারে না, কী ভেবে এলফ্রিডা জিজ্ঞেস করলো, কাল কোথায় গিয়েছিলে গিজলা ?

বেকার স্ট্রীটের এক ক্যাবারেতে নাচতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যে-বেলা ছুটি পেলেই আমি সেখানে যাবো। এতোদিন পর আমি আমার মনের মতো লোকের দেখা পেয়েছি।

কৌতূহলী হয়ে এলফ্রিডা জিজ্ঞেস করলো, কে সে ?

এক ইংরেজ ভদ্রলোক। তার নাম কিংসলে। হেসে গিজলা বললো, জানো এলফ্রিডা কিংসলে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

তাই নাকি ? তুমি তাকে কোনো কথা দিয়েছো ?

না—

অনেক লোকের সংগে এবার তোমার আলাপ হবে। কারোর সংগে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়বার আগে আরও অনেকের সংগে মিশে দেখ। নাহলে পরে অনুতাপ করতে হবে।

গিজলা হেসে বললো, না আর কারোর সংগে আমি বোধহয় মিশতে পারবো না। কিংসলে আমার সব গোলমাল করে দিয়েছে। ওকে আমার চাই-ই চাই !

এলফ্রিডা মুচকি হেসে বললো, তোমার মুখে এমন কথা কখনও শুনি নি তো। এ যে দেখছি গভীর প্রেম !

গিজলা বললো, হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি ; সত্যি খুব গভীর।

গিজলার মুখ থেকে সব কথা শুনে এলফ্রিডা লক্ষ্য করলো সে-সন্ধ্যায়ও বেরিয়ে অনেক রাত্তিরে গিজলা ফিরলো। সে রোজই বেরিয়ে যায়। কোনো কোনোদিন রাত্তিরে হাসপাতালে

ফেরে না। এলফ্রিডা মাঝে মাঝে ট্যাক্সির আওয়াজ শোনে শুধু। আর গিজলার সৌভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে তার ওপর ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে।

কয়েকদিন থেকে বেশ শীত পড়েছে। হাওয়ার জোর দেখে মনে হয় আরও ভারী ঠাণ্ডা পড়বে। প্রত্যেক বছর শীতের প্রথমে সুশোভনের শরীর খারাপ হয়। এবারেও হলো।

কিন্তু এবার তার নিজেকে বড়ো অবসন্ন মনে হচ্ছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। কার প্রতীক্ষায় সারাদিন সে ছটফট করে কাটায়। কিন্তু কেউ আসে না।

অনেকদিন গিজলার সংগে সুশোভনের দেখা হয় নি। তার সংগে দেখা করবার জন্যে সে অধৈর্য হয়ে উঠলো। ঘরে বন্ধ না থাকলে হয়তো এতো অধৈর্য হতো না সে। কোথায় থাকে আজ-কাল গিজলা সারাদিন? কী করে কাটায় সে? টেলিফোনেও একদিনও তাকে পাওয়া যায় না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে সে ভাবে কখন আবার তার সংগে গিজলার দেখা হবে।

কয়েকদিন পর আবার ফোন করলো সুশোভন। কিন্তু গিজলাকে পাওয়া গেল না। অন্যান্য দিনের মতো এবারেও এলফ্রিডা এসে ফোন ধরলো।

সুশোভনের কণ্ঠস্বর শুনে সে বললো, কেন শুধু শুধু ফোন করে সময় নষ্ট কর সুশোভন? গিজলা তোমার সংগে আর দেখা করতে চায় না।

অবাক হয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, কেন?

বিদ্রূপের হাসি হেসে এলফ্রিডা বললো, কতো নতুন বন্ধু ও পেয়েছ। এখন তাদের নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু আমি ওকে টেলিফোনে একবারও পাইনা কেন এলফ্রিডা?

কেমন করে পাবে? অবসর সময়ে ও তো এখানে থাকে না। নানা রকম বন্ধু বান্ধব নিয়ে রাত্তিরেও বাইরে কাটায়। শুনছি এক নাইট ক্লাবে ও নাকি নাচতে আরম্ভ করেছে, একটু চুপ করে থেকে এলফ্রিডা বললো, লেখাপড়া করবার মেয়ে ও নয় সুশোভন। তুমি ওর আশা ছেড়ে দাও। ও তোমার সংগে এমন ব্যবহার করছে বলে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি—

তোমার লজ্জা পাবার কী আছে এলফ্রিডা?

কারণ আমি ওর মতো মেয়ের সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

সুশোভন হেসে বললো, খুব ভালো কাজ করেছিলে। যাক ওকে একদিন আমার সংগে দেখা করতে বলতে পারো? আমার শরীর খুব খারাপ।

বলবো নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু মনে করো না সুশোভন, আমি জানি তোমার সংগে দেখা করবার ওর আর সময় হবে না।

কী এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন এই অল্প সময়ের মধ্যে গিজলার হলো সেকথা বুঝতে না পেরে সুশোভন বললো, কী হয়েছে ওর?

ও একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। এক হাসপাতালে কাজ করলেও আমার সংগে ভালো করে কথা বলে না। দামী দামী জামা কাপড় পরে, আজকাল ওর কাছে অনেক টাকাও থাকে—

কোথা থেকে পায়?

ওর মতো মেয়ে কোথা থেকে টাকা পায় সেকথা বুঝতে পারো না কেন সুশোভন? ওর কথা ভেবে তুমি মন খারাপ করো না, একটু ইতস্তত করে এলফ্রিডা বললো, সুশোভন আমাকে তুমি লেখাপড়া শেখাবে?

সুশোভন বললো, আমি ওয়েটারের কাজ করছি এলফ্রিডা, লেখাপড়ার সংগে তো আমার আর সম্পর্ক নেই।

এলফ্রিডা বললো, তোমার কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়—

কেন ?

ওসব কাজ কি তোমার সাজে ?

অনেক কাজ তো অনেকের করবার কথা নয়। তবু করতে হয়। আমিই বা ওয়েটারের কাজ করতে পারবো না কেন ?

যা খুশি কর। কিন্তু আমার মতো মেয়ে যদি তোমার বন্ধু হতো তাহলে কখনও তোমাকে ও কাজ করতে দিতো না—

আমি কারোর জন্যে এ কাজ করছি না। নিজের তৃপ্তির জন্যেই করছি।

সুশোভনের ওপর এলফ্রিডার রাগ হলো হঠাৎ। গায়ে পড়ে ওর সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা না করলেই ভালো হতো।

ও বললো, আচ্ছা সুশোভন আজ যাই ?

গিজলাকে বলো আমার অসুখ—একদিন যেন আমাকে দেখতে আসে।

বলবো, এলফ্রিডার খুব জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু সুশোভন ততক্ষণে টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে।

এলফ্রিডার মুখে সব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গিজলা সেই দিন দুপুর তিনটেয় সুশোভনকে টেলিফোন করলো, শুনলাম তুমি আমাকে অনেকবার ফোন করেছিলে—কী ব্যাপার ?

তুমি কেমন আছো গিজলা ?

খুব ভালো, গিজলার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না সুশোভন কেমন আছে। তার কথা ভাবলেই আজকাল রাগ হয়।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, তোমার সংগে আবার কবে দেখা হবে ?

বলতে পারি না। আমি আজকাল সব সময় ব্যস্ত থাকি। কাজ না থাকলে নাচতে যাই।

কদিন থেকে আমার জ্বর হচ্ছে, বড়ো করুণ শোনালো সুশোভনের কণ্ঠস্বর, একবার সময় করে কি অল্পক্ষণের জন্যে আসতে পারো না ?

সুশোভনের দীন কণ্ঠস্বর শুনে গিজলা জ্বলে উঠলো, দেখ এখানে আমি নার্সের কাজ করি। তাই অবসর সময়ে সুস্থ লোকের সংগে আনন্দে কাটাতে চাই। এখান থেকে বেরিয়ে রুগীর সেবা আমি করতে পারবো না। আমার সংগে দেখা না করে তুমি একজন ডাক্তারের সংগে দেখা কর। তাহলে তোমার উপকার হবে।

অবাক হয়ে সুশোভন জিজ্ঞেস করলো, গিজলা তুমি আমার সংগে এমন করে কথা বলছো কেন ? তোমার কী হয়েছে ?

কিছু না। আমি খুব ভালো আছি।

তুমি কি কোনো কারণে আমার ওপর বিরক্ত হয়েছো ?

হ্যাঁ। তোমার ওই নোংরা ঘরে তুমি আমাকে আর যেতে বলো না। আমি যেতে পারবো না।

তুমি যদি আসতে না চাও তাহলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আসতে বলবো না। কিন্তু আমি শুধু জানতে চাই আমার ওপর তুমি হঠাৎ এমন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলে কেন ? আমি তো তোমার সংগে কোনো অশোভন আচরণ করিনি।

না। কিন্তু তোমাকে আর আমার ভালো লাগে না। তোমার সংগে আমার আগাগোড়া অমিল। আমি যেমন তোমাকে নাচ শেখাতে পারি না, তুমিও তেমন আমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারো

না। এতোদিন লেখাপড়া শেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আমি শুধু সময় নষ্ট করছি তা সারাজীবন আমার কাজে লাগবে—

সুশোভন তবুও প্রশ্ন করলো, এখন কী করছো তুমি?

গিজলা বললো, একজনের সংগে সম্প্রতি আমার আলাপ হয়েছে, সে তার নাচের দলে আমাকে ব্যালেরিনা হয়ে যোগ দিতে দেবে। তারপর তাদের সংগে শিগগিরই আমি দেশ-বিদেশ ঘুরতে চলে যাবো।

কবে যাবে?

সেকথা এখন বলতে পারবো না। তবে খুব শিগগিরই আমি লণ্ডন ছেড়ে যাবো তাই লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে আর তুমি আমার ক্ষতি করো না। অভাবের হাত থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পাবার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। তুমি তোমার সংগে দেখা করতে বলে অভাবের রূপ আমাকে দেখিও না। আমি এখন খুব সুখে আছি। দয়া করে আমাকে সুখে থাকতে দাও সুশোভন!

তাই হবে গিজলা, আমি এতো কথা জানতাম না তাই তোমাকে বারবার ফোন করে বিরক্ত করতাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সুশোভন ফোন রেখে দিলো।

ওদিকে আমি বেশ অসুবিধায় পড়লাম। কিছু না জানিয়ে হঠাৎ হানা আমার সংগে দেখা করা বন্ধ করলো। আগে কোনো-রকম ইঙ্গিত দিলে আমি অনায়াসেই প্রস্তুত হতে পারতাম। এলক্রিডার বেলায় যেমন হয়েছিলাম। কার যে কখন কী মতি হয় বোঝা ভার।

এই জার্মানীর ওপর রাতিমতো ক্ষেপে গেলাম আমি। ভাব-লাম ও দেশের মেয়েদের সংগে আর কিছুতেই মিশবো না।

এবার অন্য দেশের মেয়ের সংগে আলাপ করতে হবে। তাই যথারীতি প্রতি সন্ধ্যায় আবার ক্লাবে যেতে লাগলাম।

এবার যার সংগে আলাপ হলো সে নরওয়ের মেয়ে। ইবসেন, হ্যামস্যুনের দেশের লোক। নাম ইভা। দেখতে জার্মান মেয়ে-দের চেয়ে অনেক ভালো।

এর সংগে ঘনিষ্ঠতা করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিলো। আর কতোবার, কোথা থেকে আসছো ? কদিন আছো ? এদেশ কেমন লাগছে ?—সেই একঘেয়ে কথা বলে আলাপ জমাবার চেষ্টা করা যায়!

আর আশ্চর্য, এই ধরণের ক্লাবে এলে কে বলবে লণ্ডনে যুদ্ধের পর মেয়ের সংখ্যা বেশি আর ছেলের সংখ্যা কম। একটা মেয়েকে ঘিরে বসে থাকে চারটে সিলোনিজ, পাঁচটা নিগ্রো, বহু ভারতীয়—আরও কতো জাত তার হিসেব রাখা কঠিন।

ইভার সংগে আলাপ করবার সময় একটা সুবিধা ছিলো যে তখন কোনো ভারতীয় দল সগৌরবে লণ্ডন স্টেজে বিভিন্ন নৃত্য দেখিয়ে বেশ নাম করেছিলো।

অন্য ছেলেরা যখন ইভাকে নতুন পেয়ে তার সংগে আবোল তাবোল কথা বলবার চেষ্টা করছে আমি তখন ধাঁ করে ব্যূহ ভেদ করে বললাম, নরওয়ের লোক তুমি। খুব বুদ্ধিমান জাত ওরা। আর পরের দেশের সংস্কৃতির ওপর ওদের ঝোঁকও খুব—ইভা মন দিয়ে আমার কথা শুনতে লাগলো।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, আর জানো ভারতবর্ষের নাচ অদ্ভুত। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ দল এখন এখানে নাচ দেখাচ্ছে। চলো একদিন দেখে আসি ?

নিশ্চয়ই, ইভা খুব উৎসাহের সংগে বললো, অনেক ধন্যবাদ। কবে যাবো বল ?

ও নাচ না দেখে একদিনও থাকা উচিত নয়। এখুনি চলো।

ইভা সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বেশ চলো।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ইভার হাত ধরে সগৌরবে বেরিয়ে গেলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি বললাম, দেখ ইভা, আজ বড়ো দেরি হয়ে গেছে—আমার একেবারেই খেয়াল ছিলো না। তাই এক কাজ করি চলো, আমরা আজ কোথাও সাপার খাই? আমি আগে থেকে টিকিট কেটে রাখবো, তারপর কাল কিংবা তুমি যেদিন আসতে পারবে সেদিন ভারতীয় নাচ দেখতে যাবো—

ইভা বললো, কাল আসতে পারবো আমি।

বেশ তাহলে কালই নাচ দেখতে যাওয়া যাবে।

তখন কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে আমি নানারকম কথা বলে ইভার কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইভা আমার বেশ ভক্ত হয়ে পড়লো। এমন কি, একদিন আমার হাত ধরে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি!

আমি বললাম, বাঃ, শুনে বড়ো খুশি হলাম।

আর তুমি? তুমি কিছু বলছো না যে?

আমার মুখ দেখে বুঝে নাও।

তুমি বড়ো চালাক।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আগে ছিলাম না, এদেশে এসে হয়েছি—

আমাকে বাধা দিয়ে ইভা বললো, কই, বললে একদিন ইণ্ডিয়ান খাওয়া খাওয়াবে—খাওয়ালে না তো?

মনে মনে তাকে অভিশাপ দিয়ে ভাবলাম, কী আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়ে! প্রেমের কথার পরই পেটের চিন্তা।

মুখে বললাম, দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম। চলো, আমার বাড়িতে যাবে আজ?

ইভা সভয়ে বললো, না না।

কেন?

ইভা হাসলো, আগে ভালো করে জানি তুমি কেমন লোক। এতো অল্প আলাপে তোমার বাড়ি যাবার সাহস আমার নেই।

আমি বললাম, কেন আমাকে তোমার ভয় কিসের?

তোমাদের দেশের কোনো লোকের সংগে আমি আগে কখনও মিশিনি—

কিন্তু তাতে কী হয়েছে? একটু আগে তো তুমি বললে আমাকে ভালোবাসো?

তবু আরও কিছুদিন তোমাকে ভালো করে জানতে চাই। তারপর তুমি যখনই বলবে তখনই তোমার বাড়িতে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাবো।

আমি বললাম, আজ গেলে আমি নিজে রান্না করে তোমাকে খাওয়াতাম—

না, ক্ষমা করো, ইভা মুচকি হেসে বললো, আজ যেতে পারবো না। তার চেয়ে চলো কোনো ভারতীয় রেস্তোরাঁয় যাই?

তাই চলো, ইভার হাত ধরে আমি পিকাডিলির টিউব ট্রেন ধরলাম।

নিজের ওপর আমার রাগ হলো হঠাৎ। ইভার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, ও বোকা নয়। ওর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আমার বেশ সময় লাগবে। কিন্তু সময় আমার বেশি নেই। পরীক্ষা শেষ হয়ে

গেছে। আমার দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো। তাই এখন নিজেকে জানাবার বেশি সুযোগ কাউকে দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুদিন আগে হলে ইভার মুখ থেকে অমন কথা শোনবার পর আমি তাকে সংগে সংগে বিদায় করে দিতাম। আজ ওকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। এদেশের সব কিছুর ওপর যাবার বেলায় আমার যেন বড়ো বেশি মায়া পড়ে গেছে। দেশে ফেরবার সংগে সংগে শেষ হয়ে যাবে এই যৌবন। সেখানে এমন করে খেলা করা চলবে না। হিসেব করে চলতে হবে প্রতি পদে। সেখানে সম্পর্ক গড়া যেমন সময় সাপেক্ষ ভাঙ্গা তেমনি কঠিন।

পিকাডিলিতে নেমে ইভাকে নিয়ে হন হন করে 'কোহিনুরে'র দিকে এগিয়ে চললাম। বেশ প্রসিদ্ধ ভারতীয় রেস্তোরাঁ। দিশি খাবার ইচ্ছে হলে আমি সব সময় এখানে আসি।

অবিশ্রাম তুষার ঝরছে। পথ নির্জন। মাঝে মাঝে শুধু গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় কিন্তু বেশ ভিড়। চেয়ার খালি নেই একটিও।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখে ম্যানেজার উঠে এসে বললো, একটু অপেক্ষা করুন। এখুনি জায়গা হয়ে যাবে স্যার!

আমি বললাম, ঠিক আছে আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ইভার সংগে গল্প করতে লাগলাম।

ভাবলাম এবার থেকে আর কাউকে অতো আগে দিশি খাওয়ার কথা তুলবো না। কারণ এতে খরচ অনেক বেশি। ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই যদি সম্পর্ক ভেঙে যায় তাহলে শুধু শুধু আমার পয়সা নষ্ট হবে।

ইভা কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস

করলো, আচ্ছা এমন হয় কেন ? তোমাদের দেশের লোকেরা কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ তামাটে—

আমি বাধা দিয়ে রসিকতা করলাম, আর তোমাদের সকলের এক রকম রঙ—না ?

ইভা বললো, হ্যাঁ।

আমি বললাম, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা চলতি হাসির গল্প আছে। এক ইংরেজ ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানে কোনো লোককে এই প্রশ্ন করে। তাতে সে উত্তর দেয়, ঘোড়া নানা রঙের হয় কিন্তু গাধাগুলো সবই এক রঙের, ইভার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে আমি আবার বললাম. আসলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকৃতির জন্যেই এমনি হয়—কোনো দেশ ঠাণ্ডা আর কোনো দেশ গরম। এখানকার মতো আমাদের সব প্রদেশের প্রকৃতি একরকম নয়।

ইভা বললো, ও, তারপর সামনে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললো, ওই যে টেবিল খালি হয়েছে। চলো ওদিকে যাই ? আমি ইভার কথা শুনে মনে মনে হেসে এগিয়ে গেলাম। চেয়ার টেনে বসবার সংগে সংগে মেন্যু হাতে নিয়ে ওয়েটার এসে আমার পাশে দাঁড়ালো।

কিন্তু ওয়েটারের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। হাত থেকে মেন্যু মাটিতে পড়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলাম, সুশোভন !

এখানে চেঁচিওনা, খুব আস্তে সুশোভন বললো, যদি আমার সংগে কথা বলতে চাও, রাত ঠিক এগারোটায় সময় পিকাডিলি টিউব স্টেশনের বুকিং অফিসের কাছে অপেক্ষা করো। আমি ঠিক সময় যাবো।

কিন্তু আর একবার আমার মুখ থেকে ঠিক তেমনি করে বেরিয়ে এলো, সুশোভন !

হেসে মেনু আমার হাতে তুলে দিয়ে বিনীত স্বরে সে বললো, ইয়েস স্যার ?

আমি তার দিকে না তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইভাকে বললাম, ইভা এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সুশোভন, মনে থাকে যেন রাত ঠিক এগারোটায়—

গম্ভীর স্বরে সুশোভন বললো, ছেলেমানুষী করো না, বসো—

আমি এখানে কিছু খেতে পারবো না সুশোভন।

খুব পারবে। তুমি এখান থেকে এভাবে উঠে গেলে আমাকে সকলে নানা প্রশ্ন করবে সেকথা বুঝতে পারো না কেন ?

আমি সুশোভনের কথায় বসে পড়ে ইভার দিকে মন্ত্রচালিতের মতো মেনু বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নাও ইভা, কী খাবে ওকে বলে দাও।

তুমি কী খাবে ?

আমার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে, কিছু খেতে পারবো না। শুধু এক কাপ কফি।

সুশোভন অর্ডার নিয়ে চলে যেতে ইভা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওকে চেনো বুঝি ?

ইভার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আমি শূন্য দৃষ্টিতে ওপরে তাকিয়ে রইলাম। আমার বুকে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো সেকথা ইভার মতো মেয়েকে কেমন করে বোঝাবো !

কোনো রকমে কফি শেষ করে ইভাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে বললাম, সত্যি ইভা আমার শরীর ভয়ানক খারাপ হয়ে পড়েছে।

আজ তুমি বাড়ি যাও। আমাকে ক্ষমা করো। আমি পরে তোমাকে ফোন করবো।

ইভা বললো, বেশ তো ছিলে। কিন্তু ওই ওয়েটারটাকে দেখে কী হলো তোমার হঠাৎ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ইভা, সব ভুলে কঠিন স্বরে আমি বললাম, ও ওয়েটার নয়। তুমি বাড়ি যাও।

ইভাকে আমি আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেছে। হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেছে। এখুনি বুঝি আমার সমস্ত দেহ জমাট তুষারের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাত ঠিক এগারোটার সময় ক্লান্ত সুশোভন আমার ঘাড়ে হাত রেখে বললো, কেমন আছো?

সেকথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, তুমি একটা মেয়ের জন্যে এতো দূর নিচে নেমে যাবে সেকথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি—

সুশোভন হেসে বললো, নিচে নামবো কেন? আমি তো বরং অনেক ওপরে উঠে গেছি।

ভেবেছিলাম বিদেশে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু এ কী করলে তুমি সুশোভন?

তুমি দেখ না আমি আস্তে আস্তে কী করি।

থাক, আমি আর কিছু দেখতে চাই না, সুশোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বিয়ে হলো কবে?

বিয়ে! কী বলছো তুমি?

গিজলা কোথায়?

গিজলা ! স্বপ্নঘোর থেকে যেন সুশোভন জেগে উঠলো, সে তো অনেক দিন চলে গেছে।

কোথায় ?

ঠিক জানি না। এখন বোধ হয় আমেরিকায় আছে।

সুশোভনের কথা শুনে আমার প্রতি রোমকূপে যেন আগুন ধরে গেল, আমি জানতাম এমনি করে তোমার সর্বনাশ করে ও চলে যাবে—

না সর্বনাশ ও করে নি।

আমি গলার স্বর আরও তুলে বললাম, অকৃতজ্ঞ মূর্খ ডাইনি ! ওকে গুলি করলে তবে আমার রাগ যায়।

গম্ভীর স্বরে সুশোভন বললো, থামো।

না, আমি থামতে পারবো না। তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারো কিন্তু আমি পারি না। একটা অতি সাধারণ মেয়ে তোমাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে গেল সুশোভন !

মিথ্যা কথা, দৃঢ়স্বরে সুশোভন বললো, বললাম তো গিজলা দিয়ে গেছে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

না দেখতে পাচ্ছো না, ডান হাতের গ্লাবস্ ঠিক করতে করতে সুশোভন বললো, বাইরের পরিবর্তন হয়তো তোমার চোখে পড়ছে কিন্তু আমার মনের পরিবর্তনের কথা এতো অল্প সময়ে তুমি জানবে কেমন করে ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, দরকার নেই আমার জানবার। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। তুমি ইচ্ছে করলে তো অনেক ভালো চাকরি করতে পারতে। এই ছোটোলোকের কাজ নিলে কেন ?

সুশোভন বললো, তোমরা যাদের বল ছোটোলোক, সব দম্ভ ভুলে আমি তাদের সংগে এক হয়ে যেতে চাই—তাদেরই শিক্ষা দিতে চাই। গিজলা আমাকে সমবেদনার—সহানুভূতির মহামন্ত্র শিখিয়ে গেছে। ভদ্রলোকের পাশে বসে আমি কাজ করতে চাই না—পারবো না।

একটা ছোটোলোককে যখন কিছু শেখাতে পারলে না তখন পৃথিবীসুদ্ধ—

বাধা দিয়ে সুশোভন বললো, আমার ভুল হয়েছিলো। মনস্তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা ছিলো না বলে হয়তো ঠিক পরিমাণ সমবেদনা ছিলো না। আর তাই তো গিজলা চলে গেল, সুশোভন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

কবে গেল ও? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লণ্ডনে ছিলো সেদিন অবধি। আমার সংগে শেষ দেখা হয় মাস খানেক আগে। এক ইংরেজ ভদ্রলোককে বিয়ে করবার পর আমার সংগে আর দেখা করে নি।

হুঁ, আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, মানে এক পয়সাওলা লোকের দেখা পেয়ে তাকে সংগে সংগে বিয়ে করে ফেলে। তোমার কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করে নি—

কেনই বা করবে?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, শোনো সুশোভন, কৃতজ্ঞতা সমবেদনা সহানুভূতি—এসব কথার মানে ও ধরনের মেয়েরা কোনোদিনও বুঝবে না—বুঝতে চাইবে না। আমি অনেক দেখে তবে এ সার বাণী উপলব্ধি করেছি। আর তুমি এমনি করে সমস্ত বিসর্জন দিয়ে সোনার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে! তোমার দিকে আমি তাকাতে পারছি না সুশোভন।

সুশোভন বললো, কে বলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, ও হাসলো, আমি তো বলেছি আমি এবার থেকে তাই করবো, পৃথিবীর কোনো অধ্যাপক কোনোদিনও যা করতে পারে নি—

তোমার কথা আমি শুনতে চাই না।

তোমাকে শুনতেই হবে। কেন তুমি আমার ওপর অবিচার করবে, আমার হাত শক্ত করে ধরে সুশোভন বললো, ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে ফেলে তোমরা যাদের বল অশিক্ষিত ছোটোলোক আমি তাদের দলে নাম লেখাবো—

এর মধ্যেই তো লিখে ফেলেছো তুমি।

সুশোভন বললো, হ্যাঁ লিখে ফেলেছি বলতে পারো। এবার হৃদয় দিয়ে তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে আস্তে আস্তে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে তুলবো। তাড়াহুড়ো করে আর কিছু করতে যাবো না।

সুশোভন, আবার নতুন করে অপমানিত হবার আগে, নিজের সর্বনাশ করবার আগে দেশে ফিরে চলো। অনেক হয়েছে।

তুমি বিশ্বাস কর গিজলা আমাকে কোনো অপমান করে নি—সর্বনাশও করে নি। জীবনের দাবী শুধু সে অস্বীকার করতে পারে নি।

আমি বললাম, সুশোভন হয় তুমি মূর্খ নয় দেবতা। আমি ভেবে পাচ্ছি না এখনও কেমন করে তুমি এসব কথা বলতে পারছো।

আমি ঠিকই বলছি। আমারই ভুল হয়েছিলো। গিজলার ওপর আমি অন্যায় করেছিলাম। যথেষ্ট পরিমাণ সমবেদনা হয়তো আমার ছিলো না।

কিন্তু অমন একটা মেয়ের জন্যে তুমি কী করতে বাকি রেখেছিলে সুশোভন? সব ছেড়ে একমাত্র তাকে নিয়েই তো তুমি মেতে উঠেছিলে? এতো সমাদর অন্য কোনো লোকের কাছ

থেকে ও জাতের মেয়েরা আশা করতে পারে ? যেটুকু দেবার তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছিলে বলে এমনি করে ও তোমাকে পথে বসিয়ে গেল।

তুমি যা-ই বলনা কেন, আমি বলবো নিজের দোষে তাকে আমি হারালাম। তার পৃথিবী থেকে আমি হঠাৎ জোর করে তাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলাম। যে কোনোদিনও লেখাপড়া করে নি আমি তাকে দিনরাত পড়তে বলতাম—

সুশোভনের কথার অর্থ ধরতে না পেরে বললাম, অমন মেয়েকে নিয়ে অতো মাথা ঘামাতে আমি তো তোমাকে প্রথমেই বারণ করে দিয়েছিলাম।

সংযত স্বরে সুশোভন বললো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম তার মনের গঠন ঘোরাতে গেলে সময়ের দরকার, ধৈর্যের দরকার, অধ্যবসায়ের দরকার। আর সেইখানেই আমি ভুল করেছিলাম। যদি অনেক বন্ধুবান্ধবের মাঝে রেখে নৃত্যসাধনার সুযোগ দিয়ে তার নিজের পৃথিবী থেকে আমি আস্তে আস্তে তাকে অন্য জগতে নিয়ে আসতাম তাহলে এমন করে আমি ব্যর্থ হতাম না, গিজলা কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যেতো না। অত্যাচারী ভেবে, অনেক দূরের মানুষ মনে করে দারুণ বিরক্তিতে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

তুমি যা-ই বল না কেন সুশোভন, আমি জানতাম ও তোমাকে ছেড়ে যাবেই। ওরা টাকা ছাড়া আর কিছু জানে না, জানতে চায় না। তুমি শুধু শুধু অমন একজন মেয়ের জন্যে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলে !

সুশোভন ম্লান হাসলো, জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে হলে অনেক সময় লাগে। তবু গিজলার সম্পর্কে আমি বলবো, তার শিক্ষার জন্যে আমি যে সময় ব্যয় করেছি তা কখনও বিফলে যায়

না—যেতে পারে না। ·

ওই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া তোমার আর উপায় কী। গিজলা যেমন মেয়ে ঠিক তেমন কাজই করেছে।

সুশোভন ম্লান হাসলো, ইকনমিক্সের ছাত্র হয়ে তুমি এমন করে ওর দোষ ধরছো কেমন করে? গিজলার কোনো দোষ আমি দেখতে পাই না। ও যা স্বাভাবিক তাই করেছে।

তুমি বোধহয় প্রেমে অন্ধ হয়ে আছো। তাই এসব কথা এখনও বলছো। কেন তুমি ওর দোষ ধরতে পারছো না সুশোভন?

কারণ আমি ওর সব কথা জানি। যুদ্ধের পর জার্মাণীর কী অবস্থা হয় সেকথা কারোর অজানা নেই। তুমি তো জানবেই। গিজলা বন্ধুবান্ধব হারিয়েছে, ওর ঘর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, বাপ মা ছেড়ে বিদেশে ঝিয়ের কাজ করে অন্ন জোটাতে এসেছে। নির্জলা উপবাসে ওর কতোদিন কতো রাত কেটে গেছে ঠিক নেই। তাই আজ সম্পদের দিকে ওর মন তো ঝুঁকবেই। ও সব চেয়ে আগে চাইবে পার্থিব সুখ সুবিধা আর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।

তুমি তো সবই ওকে দিয়েছিলে?

আমি কতোটুকু দিতে পারি বল? যে ওকে আমার চেয়ে অনেক বেশি দিতে পারবে ও তো তার কাছে যাবেই। তুমি কি জানো না আর্থিক অনটনের জন্যে কতো প্রেম ধূলো হয়ে যায়—কতো সাজানো ঘর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সুশোভন বলে চললো, (আজ সমস্ত পৃথিবীর যে অবস্থা হয়েছে তাতে মানুষের কাছে অর্থের চেয়ে বড়ো কেউ নয়—কিছু নয়।) কারণ উপায় নেই। পেটের ক্ষিধে না মিটলে মন কেমন করে ব্যাপক কল্পনায় মেতে উঠবে?

আমি বললাম, তুমি যদি সবই জানতে তাহলে ঠিক এ সময় ওই

মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার বৃথা চেষ্টা করে সময় নষ্ট করলে কেন?

শান্ত হাসি হেসে সুশোভন বললো, জ্ঞানের এক কণাও বিফলে যায় না বলে। এ সামান্য কথাটা বুঝতে তুমি এতো সময় নিচ্ছো কেন? গিজলার আর্থিক দ্বন্দ্ব যেদিন ঘুচে যাবে, কোনো অভাব থাকবে না, ও যখন শান্ত হয়ে ভাবতে বসে যাবে নিজের সুখদুঃখের কথা তখন আমি জানি সব চেয়ে আগে ওর আমার কথাই মনে মনে পড়বে, একটু থেমে সুশোভন আবার বললো, অভাব আর দারিদ্র্যে মানুষের মন মৃতপ্রায় হতে পারে কিন্তু একেবারে মরে যায় না। গিজলার মৃতপ্রায় মনে আমি জ্ঞানের যে শিখা জ্বালাবার চেষ্টা করেছি আজ তা ম্লান। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন তারই আলোয় ওর হৃদয় ভরে যাবে আর সেদিন জীবনের গভীরে ও সহজেই প্রবেশ করতে পারবে। ওব হয়তো তখন আমার কাছে ফিরে আসবার আর উপায় থাকবে না। কিন্তু আমি ওর কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম তাই পাবো। আজ থেকে আমি শুধু সেদিনেব প্রতীক্ষা করবো।

পিকাডিলি টিউব স্টেশনে বেশি লোক নেই। মাঝে মাঝে শুধু জুতোর খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে আর এস্কেলেটারের একটানা আওয়াজ।

সুশোভনের চোখে সহসা ঘোর নেমে এলো। তুষার নেই, ব্লিজার্ড নেই, কোনো হাহাকার নেই পৃথিবীতে। ভালো করে বেঁচে থাকবার সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ এপ্রিলের অকৃপণ আলোয় অনেক দূরে দৃষ্টি পড়লো সুশোভনের। রবিনের আনাগোনা চলেছে এখানে ওখানে, স্কাইলার্ক পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, কতো গন্ধহীন রঙ বেরঙের নাম জানা না জানা ফুল হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। তখন ইউক্যালিপটাসের ছায়া ঘেরা পথ দিয়ে শান্ত পদক্ষেপে কে

এগিয়ে আসছে তার দিকে! গিজলাকে চিনতে একটুও দেরি হয় না সুশোভনের।

আমি শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, দেশে ফিরবে কবে?

ফিরবো এখন একদিন। এতো ব্যস্ত হবার কী আছে? বাবাকে অনেকদিন আগে টাকা পাঠাতে বারণ করে দিয়েছি।

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে।

সুশোভন বললো, চলো একটু রাস্তায় ঘুরি?

এই রাত বারোটায়? প্রচণ্ড বরফ পড়ছে যে?

তাই দেখতেই তো যাবো। চলো, একদিনে কোনো অসুখ করবে না।

না না অসুখের কথা নয়। আচ্ছা চলো!

অনেক দিন পর আবার সুশোভনের সংগে রাস্তায় বেরোলাম। আমরা সেই মধ্য রাত্রে পিকাডিলির চারপাশে নিঃশব্দে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোনো কথা বললাম না। বলবার কথা তো আর কিছু নেই।

অমন প্রচণ্ড তুষারপাত আমি আর কখনও লণ্ডনে দেখি নি। সমস্ত লণ্ডন নগরী যেন নিস্পন্দ হয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণ বাতাসের ঝাপটায় লক্ষ বরফের কুচি আমাদের চোখে মুখে তীরের ফলার মতো বিঁধছে। রাস্তায় আমরা ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই।

সুশোভন একসময় কথা বললো, এমন করে ঘুরে বেড়াতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না। কিন্তু তুমি আর কতোক্ষণ এই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াবে?

জানি না। হয়তো সারারাত।

কিন্তু কেন?

ভালো লাগে বলে। আমার সব কিছুই আজকাল ভালো লাগে। কারণ তুমি যা-ই মনে করো, আমি জানি আমি আমা সত্যকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছি।

আমি উত্তর দিলাম না। সুশোভন আবার বললো, গিজল এতোদিন আমার কাছে মিথ্যা হয়ে ছিলো। কারণ বন্ধনই তে মায়া। আর তা মিথ্যা। কিন্তু আজ সব বন্ধন ছিঁড়ে, মায়া আবরণ সরিয়ে সে আমার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে বড়ো সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই।

এবারেও কিছু বলতে ইচ্ছে হলো না আমার। সুশোভনও আর কোনো কথা বললো না। ইরসের মূর্তির পাশ দিয়ে ঘুরে নিঃশব্দে আমরা সেণ্ট্ জেমস স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগালাম। আমি দেখতে চাই সুশোভন আর কতোক্ষণ এমনি করে ঘুরে ফেরে।

তাকে একেবারে চুপ করে থাকতে দেখে অনেকক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবছো সুশোভন?

ভাবছি না—দেখছি।

কী দেখছো?

আমার তাজমহল!

অবাক হয়ে আমি বললাম, তাজমহল?

হ্যাঁ, ভাঙা গুঁড়ো গুঁড়ো তাজমহল, একমুঠো তুষার তুলে আমার সামনে মেলে ধরে ও বললো, দেখতে পাচ্ছো না মর্মর তাজ টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে? কার চোখের জলে ভেজা লক্ষ মণিকর্ণিকা খুঁজে ফিরছে কোন পলাতকাকে!

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার সমস্ত দেহ তুষারে তুষারে একেবারে শাদা হয়ে গেছে।

আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।